# মজুরী ও মূলধন

( মার্কস্‌বাদের আলোচনা সহ )

কার্ল মার্কস্‌

১৩২৯ সন

অনুবাদক—শ্রীফণীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীহৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়
১২নং মণ্ডল ষ্ট্রীট
উত্তরপাড়া

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়
মূল্য আট আনা মাত্র

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১ নং পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

এতদিন ধরিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জ্জোয়া অর্থনীতিক-গণের তথ্যগুলিই সকলে গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু আজ কাল আর কেহ সেগুলিকে বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গলদসমূহ যতই আত্মপ্রকাশ করিতেছে ততই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জ্জোয়া মতবাদের পরিবর্ত্তে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অধিকতর বৈজ্ঞানিক বলিয়া গৃহীত হইতেছে। আমাদের দেশেও সমাজতন্ত্রবাদের ক্রমবিস্তারের ফলে এই নূতন চিন্তাধারার উপর জনসাধারণ ক্রমশঃ আস্থা-

স্থাপন করিতেছে ; কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিবাদ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকায় এই ভাবধারার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে অনেকেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের জন্মদাতা কার্ল মার্কসের 'বাড়তি-মূল্য নীতি' একটী বিশিষ্ট দান। তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তিকা 'wage-labour and capital' এ মার্কস্ তাঁহার এই তথ্যকে অল্পের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

'মজুরী ও মূলধন' 'wage-labour and capital' এর অনুবাদ। বুর্জ্জোয়া অর্থনীতিবিদ্গণের যুক্তি খণ্ডন করিয়া মার্কস্ যে ভাবে তাঁহার মতকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—এই অনুবাদে আলোচনার সেই ধারাকে বরাবর অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে পাঠকপাঠিকাগণ মার্কসের অর্থনীতিশাস্ত্রে অদ্ভুত জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব যুক্তি ও তর্কনীতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইবেন। বাংলা সাহিত্যে অর্থবিজ্ঞান সম্বন্ধে পুস্তকের এতই অভাব যে, প্রত্যেক ইংরাজী অর্থনৈতিক শব্দের যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না ; সকল দিক বিচার করিয়া যথাসম্ভব সম্পূর্ণ অর্থ বহন করে এইরূপ প্রতিশব্দই এই অনুবাদে ব্যবহৃত হইয়াছে। মার্কসের লেখার ( Italics ) এর অংশগুলি বড় অক্ষরে বা রেখাসঙ্কেতে বুঝান হইয়াছে ও শেষে তাঁহার একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত করা হইয়াছে।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কমরেড্ ব্যানার্জ্জি এই অনুবাদের পাণ্ডুলিপিখানি আরও কয়েকটী পাণ্ডুলিপির সহিত আমাকে প্রকাশের জন্য দেন। কিন্তু নানা কারণে তখন ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। পরে 'গণ-নায়কে'র সম্পাদক মহাশয় আমার কাছে পাণ্ডুলিপিখানি দেখিয়া তাঁহার সাপ্তাহিকে প্রকাশের জন্য গ্রহণ করেন ও নিয়মিতভাবে ইহা প্রকাশ করিতে থাকেন। ঐ সময়েই কয়েকজন বন্ধু 'মজুরী ও মূলধন' পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য আমাকে অনুরোধ করেন— তাঁহাদের অনুরোধে ও সাহায্যেই ইহার প্রকাশ সম্ভবপর হইল; 'গণ-নায়কে'র সম্পাদক মহাশয়ও সানন্দে ইহার পুনর্মুদ্রণের অনুমতি দেন। আমি তাঁহাদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। পরিশেষে, আশা করি যে পুস্তিকাখানি বাংলার জনসাধারণের বিশেষতঃ ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের কাছে আদৃত হইবে।

হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়

# ভূমিকা।

১৮৪৯ সালের ৪ঠা এপ্রিল হইতে Neue Rheinische zeitung নামে জার্ম্মাণ পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে ধারাবাহিকভাবে মার্কসের 'মজুরী ও মূলধন' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ব্রাসেল্‌সে জার্ম্মাণ শ্রমিক পরিষদে তিনি যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় যে তদানীন্তন ঘটনা সমূহের ঘাত প্রতিঘাতে মার্কস্ ইহা সমাপ্ত করিতে পারেন নাই ; কারণ সে সময়ে রুশসৈন্য হাঙ্গেরীতে প্রবেশ করে ও ড্রেস্‌ডেন, ইজারলোন, এলবারফেড, ব্যাডেন প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, ফলে ১৯শে মে উক্ত পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া যায়। মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁহার কাগজ পত্রের ভিতরও এই পুস্তকের অসমাপ্ত অংশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

১৮৫০ সালের পূর্ব্বে মার্কস্ "অর্থনীতির সমালোচনা" লেখা শেষ করেন নাই—ইহা শেষ করিতে তাঁহার আরও দশ বৎসর লাগে। কাজেই এই পুস্তকের (Critique of Political Economy) প্রথম খণ্ড সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে তিনি যে সমস্ত পুস্তক রচনা করেন, তাহার সহিত ১৮৫৯ সালের পরে

তাঁহার রচিত বিষয়ে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়—এমন কি তাঁহার পূর্ব্বের লেখায় এমন অনেক বাক্য ও শব্দ আছে যেগুলি পরের লেখার সহিত তুলনা করিলে অপ্রাসঙ্গিক ও ভুল বলিয়া মনে হয়। সাধারণের জন্য যে সকল সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মার্কসের প্রথম অবস্থার রচনা সমূহ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রাখাই যুক্তিযুক্ত, কারণ তাহা হইলে গ্রন্থকারের মনের ক্রমপরিণতি বেশ বোঝা সম্ভব হইবে—ঠিক সেই কারণে তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকের একটী শব্দও পরিবর্ত্তন করার কথা আমি ভাবিতে পারিতাম না। কিন্তু বর্ত্তমান সংস্করণ কেবল শ্রমিকদের মধ্যেই প্রচারিত হইবে বলিয়া—ইহা স্বতন্ত্র কথা। বর্ত্তমান অবস্থায় মার্কস্ নিশ্চয়ই ১৮৪৯ সালের পূর্ব্বের রচনাগুলি পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নূতন মতের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতেন এবং এই সংস্করণের জন্য তিনি যতটুকু পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন মনে করিতেন, আমিও ঠিক ততটুকু পরিবর্ত্তনই করিলাম। সুতরাং আমি পূর্ব্বেই পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিই যে এই পুস্তকখানি ১৮৪৯ সালে মার্কস্ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অনুলিপি নহে, বরং ১৮৯১ সালে তিনি যাহা লিখিতেন ইহা কতকাংশে তাহার অনুরূপ। ইহার আদি সংস্করণ এত বিস্তৃতভাবে প্রচলিত হইয়াছে যে, যত দিন না পুনরায় ইহার আর একটী সম্পূর্ণ ও অপরিবর্ত্তিত সংস্করণ প্রকাশ করিতে পারি, ততদিন ইহাই যথেষ্ট হইবে।

একটী বিষয়ে আমি যথেষ্ট পরিবর্ত্তন করিয়াছি, মার্কসের

মূল পুস্তক অনুসারে—শ্রমিক মজুরীর জন্য পুঁজিপতির কাছে তাহার শ্রম (labour) বিক্রয় করে; আমি এই 'শ্রম' কথাটীর পরিবর্ত্তে "শ্রমশক্তি" (labour-power) ব্যবহার করিয়াছি। ইহা শ্রমিকগণকে বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন, কারণ এই পরিবর্ত্তন কেবল মাত্র কথার মারপ্যাঁচ নয়, পরন্তু সমগ্র অর্থনীতি শাস্ত্রের একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। বুর্জ্জোয়াগণকে পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়া দিতে হইবে যে, আমাদের তথাকথিত শিক্ষিতগণের নিকট যে বিষয় এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে, অর্থনীতি শাস্ত্রের সেই জটিল সমস্যাগুলি কত সহজে অজ্ঞ শ্রমিকদের বুঝাইয়া দেওয়া যায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী কালের অর্থনীতিকারগণ সেই সময়কার কল কারাখানার মালিকদের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত ছিল তাহাই অবিকৃত অবস্থায় গ্রহণ করিয়াছিলেন—"কারখানার মালিক শ্রমিকের শ্রম খরিদ করে ও তার জন্য অর্থ দেয়।" মালিকদের ব্যবসা চালানো ও তার হিসাব পত্র রাখার পক্ষে এই ধারণাই যথেষ্ট কিন্তু ইহাকে অর্থনীতি শাস্ত্রের গণ্ডীতে ঢোকাইলে আশ্চর্য্যজনক ভুল ও গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়।

অর্থনীতি শাস্ত্রের নিকট প্রথমেই এই সমস্যা উপস্থিত হইল যে প্রত্যেক পণ্যের এমন কি 'শ্রম' রূপ পণ্যের বাজার-মূল্যও ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হয়; নানা কারণে বাজার-মূল্যের

এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় ও প্রায়ই পণ্যের উৎপাদনের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক থাকে না অর্থাৎ আকস্মিক কারণ দ্বারাই পণ্যের বাজার-মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং অর্থনীতি শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রথম ও প্রধান কাজ হইল এই আকস্মিক কারণগুলির পশ্চাতে গুপ্ত বৈজ্ঞানিক কারণকে অনুসন্ধান করা—যাহার দ্বারা পণ্যের বাজার-মূল্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কখনও উঠিতেছে, কখনও নামিতেছে; অর্থনীতিবিদ্‌গণ সেই মূল কারণটীর অনুসন্ধানে রত হইলেন যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমাগত পণ্যের উঠা নামা চলে। অর্থাৎ তাঁহারা পণ্যের "বাজার-মূল্য" ( Price ) হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া পণ্যের "মূল্যে" ( value ) উপস্থিত হইলেন এবং এই মূল্যই যে পণ্যের বাজার-মূল্যের উঠা নামাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহাই দেখাইলেন।

পূর্ব্ব যুগের অর্থনীতিবিদ্‌গণ দেখিলেন, যে প্রত্যেক পণ্যের মধ্যে যতখানি শ্রম আছে অর্থাৎ তাহার উৎপাদনে যতখানি শ্রম লাগিয়াছে তাহার দ্বারাই পণ্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। পণ্য-মূল্যের এই ব্যাখ্যা করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট রহিলেন এবং আমরাও বর্ত্তমানে এইখানে থামিতে পারি। যাহাতে পাঠকগণ ভুল না বুঝেন সেইজন্য এইখানে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে এই মত বর্ত্তমানে অচল। মার্কস্ প্রথমে শ্রমের মূল্য উৎপাদনী শক্তি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করেন যে, সব সময়ে বাহ্যতঃ বা আসলে পণ্যের উৎপাদনে যে শ্রম লাগিয়াছে তাহার উপর পণ্যের মূল্য নির্ভর করে না। কাজেই যদিও আজ কাল আমরা রিকার্ডো প্রমুখ অর্থনীতিকারগণের সহিত সংক্ষেপে ঘোষণা করি যে, উৎপাদনে ব্যবহৃত শ্রমের উপর পণ্য মূল্য নির্ভর করে, তাহা হইলে মার্কসের গভীর কথা যেন বিস্মৃত না হই। বর্ত্তমানে ইহাই যথেষ্ট, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা মার্কসের "অর্থনীতি শাস্ত্রের সমালোচনা" ( ১৮৫৯ ) ও তাঁহার "মূলধনের" ( Capital ) প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাইবে।

কিন্তু যখনই অর্থনীতিবিদ্‌গণ "শ্রমের মূল্য উৎপাদনী শক্তি"র নীতি শ্রমরূপ পণ্যে প্রয়োগ করিলেন, তখন একটীর পর একটী গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। শ্রমের মূল্য কিরূপে নির্দ্ধারিত হয় ? এই নিয়ম অনুসারে তাহার মধ্যে যতখানি শ্রম আছে তাহা দ্বারা। কিন্তু কোন শ্রমিকের একদিনের, এক সপ্তাহের, একমাসের বা এক বৎসরের শ্রমের মধ্যে কতখানি "শ্রম" আছে ? উত্তর—একদিন, এক সপ্তাহ, এক মাস, এক বৎসরের শ্রম। যদি শ্রমের দ্বারাই সকল পণ্যের মূল্য মাপা হয় তবে আমরা "শ্রমের মূল্য" ও কেবল "শ্রম" দ্বারা মাপিতে পারি। কিন্তু আমরা যদি জানি যে এক ঘণ্টা শ্রমের মূল্য একঘণ্টা শ্রমের সমান, তাহা হইলে আমাদের কিছুই জানা হইল না। আমরা যেখান হইতে

আরম্ভ করিয়াছিলাম সেইখানেই রহিলাম, লক্ষ্যের দিকে এক পাও অগ্রসর হইলাম না।

এই গণ্ডগোল হইতে মুক্তি পাইবার আশায় অর্থনীতিক-গণ এক নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, কোন পণ্যের মূল্য তাহার উৎপাদন খরচের সমান। কিন্তু "শ্রমের" উৎপাদন খরচ কি? অর্থনীতিকগণ সোজা-সুজি এই প্রশ্নের জবাব দিতে অক্ষম হইলেন। শ্রমের উৎপাদন খরচ নির্দ্ধারণের ব্যর্থ চেষ্টা ত্যাগ করিয়া তাঁহারা শ্রমিকের উৎপাদন খরচ অনুসন্ধানে মন দিলেন। শ্রমিক উৎপাদনের খরচও স্থান কালভেদে পরিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় ও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের বিশেষ শিল্পে এই খরচও যতদূর সম্ভব বাঁধা ধরার মধ্যে থাকে। বর্ত্তমান যুগে আমরা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর ভিতর বাস করিতেছি—ইহাতে জনসংখ্যার অধিকাংশই উৎপাদনের উপায় সকলের ( যেমন যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল, কলকারখানা ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ) মালিকগণের নিকট মজুরীর বিনিময়ে শ্রম বিক্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এইরূপ উৎপাদন প্রণালীর উপর অবস্থিত সমাজে, শ্রমিক উৎপাদনের ব্যয় বলিতে বুঝায়—শ্রমিককে শ্রমের উপযুক্ত রাখিতে, বার্দ্ধক্য, রোগ বা মৃত্যু দ্বারা একজন শ্রমিক অপসারিত হইলে সেই স্থান পূরণ করিতে, এক কথায় পর্য্যাপ্ত সংখ্যায় শ্রমিক উৎপন্ন করিতে, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আর্থিক মূল্য।

মনে করুন, একজন শ্রমিকের জীবনধারণের:প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আর্থিক মূল্য তিন টাকা। আমাদের শ্রমিক নিয়োগ-কর্ত্তা-পুঁজিপতির নিকট হইতে দৈনিক তিন টাকা মজুরী পায় ও বিনিময়ে বার ঘন্টা পরিশ্রম করে। পুঁজিপতি মোটা-মুটি এই রকম হিসাব করে—মনে করুন, শ্রমিকটী কলকব্জার মিস্ত্রী ও সে একদিনে অর্থাৎ বার ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া ইহার একটি অংশ তৈয়ারী করিতে পারে। তার জন্য কাঁচা মাল যাহা লাগে তাহার দাম মনে করুন কুড়ি টাকা ও অন্যান্য খরচ ( যেমন কয়লা, ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতির ঝড়তি পড়তি বাবদ ) আরও এক টাকা। সুতরাং দেখা গেল যে, কলের ঐ অংশটি তৈয়ারী করিতে খরচ হইল মোট চব্বিশ টাকা।

কিন্তু পুঁজিপতি উহা বিক্রয় করিয়া মোটামুটি সাতাশ টাকা পাইবে বা তাহার মোট খরচের উপর আরও তিন টাকা পাইবে।

এখন প্রশ্ন এই, পুঁজিপতি যে তিন টাকা বেশী পাইল ইহা কোথা হইতে আসিল ? পূর্ব্বেকার অর্থনীতিক-গণের মতানুযায়ী পণ্য মোটামুটি তাহার মূল্য ( value ) অনুসারে বিক্রীত হয় অর্থাৎ তাহা উৎপন্ন করিতে যতখানি শ্রম প্রয়োজন হইয়াছে সেই দামে বিক্রীত হয়। কিন্তু এই সাতাশ টাকার মধ্যে একুশ টাকা আমাদের শ্রমিক কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই ছিল,—কুড়ি টাকা কাঁচা মালে ও এক টাকা কল, কয়লা ও যন্ত্রপাতির মধ্যে। সুতরাং অর্থনীতিক

গণের মতানুসারে বাকী ছয় টাকা শ্রমিক কাঁচা মালের উপর যে শ্রম করিয়াছে তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে বার ঘণ্টায় সে ছয় টাকা মূল্য উৎপাদন করিয়াছে; সুতরাং তাহার বার ঘণ্টা শ্রমের মূল্য ছয় টাকা। এই ভাবে আমরা "শ্রমমূল্য" আবিষ্কার করিলাম।

আমাদের শ্রমিক এইখানে চীৎকার করিয়া বলিবে, "থাম, থাম, ছয় টাকা? আমি ত মাত্র তিন টাকা পাইয়াছি। আমার মনিব শপথ করিয়া বলিবেন যে আমার পরিশ্রমের দাম তিন টাকাই ও আমি অধিক দাবী করিলে তিনি কর্ণপাত করিবেন না। ইহা কেমন করিয়া সম্ভব?"

আমরা এখন এক মজার গণ্ডগোলে পড়িলাম। আমরা শ্রমের মূল্য খুঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার চেয়ে অধিক পাইলাম। আমরা দেখিলাম যে, শ্রমিকের পক্ষে বার ঘণ্টা শ্রমের মূল্য তিন টাকা আর পুঁজিপতির পক্ষে সেই শ্রমের মূল্য ছয় টাকা; পুঁজিপতি ইহা হইতে তিন টাকা শ্রমিককে দেয় আর বাকী তিন টাকা পকেটস্থ করে, তাহা হইলে কি শ্রমের একাধিক অর্থাৎ দুই রকম মূল্য থাকিতে পারে?

আমরা এই আর্থিক শ্রম-মূল্যকে শ্রম-সময়ে প্রকাশ করিলে অসামঞ্জস্য আরও হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠে। বার ঘণ্টার শ্রমে ছয় টাকার পরিমাণ নূতন মূল্য উৎপন্ন হইয়াছে; তাহা হইলে ছয় ঘণ্টায় এই নবোৎপন্ন মূল্যের পরিমাণ তিন

টাকা—শ্রমিক যাহা বার ঘণ্টা শ্রমের বিনিময়ে পায়। অর্থাৎ বার ঘণ্টা শ্রম করিয়া শ্রমিক ছয় ঘণ্টার মজুরী পায়। তাহা হইলে হয় শ্রমের দুই প্রকার মূল্য আছে,—তাহার একটী অপরটীর দ্বিগুণ নতুবা বার ও ছয় উভয়ে সমান। এই উভয় ক্ষেত্রের কোনটীকেই আমরা স্বীকার করিতে পারি না। "শ্রমের" ক্রয় বিক্রয় বা "শ্রম-মূল্যের" সমস্যাকে আমরা যে দিক দিয়া ও যেমন ভাবেই দেখি না কেন, কিছুতেই এই অসামঞ্জস্যের হস্ত হইতে নিস্তার পাই না। অর্থনীতিবিদ্‌গণও এই মুস্কিলে পড়িলেন। পূর্ব্ব যুগের অর্থনীতিকগণ এমন কি রিকার্ডো প্রমুখ অর্থনীতিকগণ কেহই এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই—কার্ল মার্কস্‌ই একমাত্র ইহার মীমাংসা করিলেন।

মার্কস্‌ তাঁহার "ক্যাপিটালের" প্রথম খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন যে, এত দিন অর্থনীতিকগণ যাহাকে "শ্রমের" উৎপাদন খরচ বলিয়া ধরিয়াছেন, আসলে তাহা "শ্রমিকের" উৎপাদন খরচ এবং শ্রমিক যাহা পুঁজিপতির নিকট বিক্রয় করে তাহা "শ্রম" নহে। তাঁহার মতে যেই সত্য সত্য শ্রম আরম্ভ হয়, তখন আর ইহা শ্রমিকের অধিকারে থাকে না, কাজেই শ্রমিক ইহা বিক্রয় করিতে পারে না। বড় জোর শ্রমিক তাহার ভবিষ্যৎ শ্রম বিক্রয় করিতে পারে, অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটী নির্দ্দিষ্ট কাজ করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। কিন্তু তাহা শ্রম বিক্রয় হইল না

পরন্তু অর্থের বিনিময়ে সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার "শ্রম-শক্তি" পুঁজিপতিকে বিক্রয় করিল, সে এইরূপে তাহার শ্রমশক্তিকে ভাড়া দেয় বা বিক্রয় করে।

শ্রমিক তাহার শ্রম-শক্তি পূর্ব্ব হইতেই মজুরীর বিনিময়ে পুঁজিপতির নিকট বিক্রয় করিলে কি ঘটে? পুঁজিপতি তাহাকে কারখানায় বা ফ্যাক্টরীতে লইয়া যায়, তথায় পূর্ব্ব হইতেই কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মজুদ থাকে, কাজেই শ্রমিক শ্রম করিতে আরম্ভ করে। সে সময় হিসাবে বা জিনিষ তৈরী অনুপাতে মজুরী পায়। মনে করুন, সে বার ঘণ্টা শ্রম করিয়া কাঁচা মালের উপর ছয় টাকা পরিমাণ মূল্য বাড়াইল ও এই নব-সৃষ্ট মূল্য পুঁজিপতি পণ্য বিক্রয় করিয়া হস্তগত করে। আবার এই নব-সৃষ্ট ছয় টাকা হইতে সে তিন টাকা শ্রমিককে দেয় আর বাকী তিন টাকা পকেটস্থ করে। আবার শ্রমিক যদি বার ঘণ্টায় ছয় টাকা মূল্য উৎপাদন করে তাহা হইলে সে ছয় ঘণ্টায় তিন টাকা মূল্য উৎপন্ন করিতে পারে। কাজেই ছয় ঘণ্টা শ্রম করিয়াই আমাদের শ্রমিক পুঁজিপতির নিকট হইতে প্রাপ্ত তিন টাকা শোধ দিল—ছয় ঘণ্টার পরে তাহাদের আর কোন সম্পর্ক থাকে না, শ্রমিক পুঁজিপতির এক পয়সাও ধারে না।

পুঁজিপতি এখন চীৎকার করিয়া উঠে, "থাম, থাম, আমি সারাদিনের জন্য অর্থাৎ বার ঘণ্টার জন্য শ্রমিককে ভাড়া করিয়াছি—কাজেই ছয় ঘণ্টা শ্রম করিয়া থামিলে

চলিবে না আরও ছয় ঘণ্টা শ্রম করিতে হইবে নতুবা নিস্তার নাই।" আর শ্রমিকও ছয় ঘণ্টা শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন মূল্যের পরিবর্ত্তে বার ঘণ্টা শ্রম করিতে পুঁজিপতির নিকট স্বেচ্ছায় অঙ্গীকার করিয়াছে কাজেই তাহার অঙ্গীকার রাখিতেই হইবে।

মনে করুন, আমাদের শ্রমিক বার ঘণ্টায় বারটী পণ্য উৎপন্ন করিতে পারে, ইহাদের প্রত্যেকটীতে খরচা বাবদ তুই টাকা লাগিয়াছে এবং আড়াই টাকায় এক একটীকে পুঁজিপতি বিক্রয় করে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ইহা হইতে পুঁজিপতি প্রত্যেকটী পণ্য বাবদ শ্রমিককে চারি আনা দিবে বা মোট তিন টাকা দিবে। এই তিন টাকা উৎপন্ন করিতে শ্রমিকের বার ঘণ্টা সময় লাগিল। পুঁজিপতি কিন্তু এই বারটী পণ্য বিক্রয় করিয়া মোট তিন টাকা পাইল ও খরচ খরচা চব্বিশ টাকা বাদ দিলে পুঁজিপতির হস্তে ছয় টাকা থাকে ও তাহা হইতে মাত্র তিন টাকা শ্রমিক পায়। আমরা পূর্ব্বের সমাপ্তিতেই আসিয়া পড়িলাম অর্থাৎ বার ঘণ্টার মধ্যে শ্রমিক ছয় ঘণ্টা নিজের জন্য শ্রম করে আর বাকী ছয় ঘণ্টা পুঁজিপতির জন্য শ্রম করে।

বিখ্যাত বিখ্যাত অর্থনীতিকগণও যে সমস্যার সম্মুখীন হইতে সাহস পাইতেন না—"শ্রমের" পরিবর্ত্তে "শ্রমশক্তি" শব্দটী ব্যবহার করিয়া তাহা দূরীভূত করা হইল। আবার

বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, শ্রম-শক্তিও একটী পণ্য বিশেষ—কারণ ইহার মূল্য-উৎপাদক বিশেষ গুণ আছে, ইহা মূল্যের মূল এবং যথাযথভাবে ব্যবহৃত হইলে উহা অত্যধিক পরিমাণ মূল্য উৎপন্ন করিতে পারে। বর্ত্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় দৈহিক শ্রম-শক্তি কেবলমাত্র ইহার আভ্যন্তরীণ মূল্য বা খরচ খরচার আর্থিক মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, পরন্তু প্রত্যেক নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই, তাহার দৈনিক খরচা অপেক্ষা দৈনিক উৎপাদনের বাড়তি মূল্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

আমাদের বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক অবস্থাও এইরূপ—একমাত্র সর্ব্বহারা শ্রমিক শ্রেণীই সকল "মূল্য" উৎপন্ন করে। মূল্য শ্রমেরই নামান্তর মাত্র—যে পরিমাণ শ্রম কোন পণ্যে বর্ত্তমান তাহাই তাহার মূল্য, কিন্তু শ্রমিকগণের দ্বারা উৎপন্ন এই মূল্যে শ্রমিকের কোন অধিকার নাই। ইহা কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অর্থ প্রভৃতির মালিক পুঁজিপতির সম্পত্তি, সেই শ্রমিক শ্রেণীর শ্রম-শক্তি খরিদ করে। শ্রমিকশ্রেণী যে পণ্য উৎপন্ন করে, তাহার এক অংশ মাত্র তাহারা ফিরিয়া পায়। ইহার অন্য অংশ পুঁজিপতি শ্রেণী কলকারখানার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাড়াইয়া তুলে—কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর অংশ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না—কখন কখন খুব ধীরে

ধীরে অল্প পরিমাণে বাড়ে আবার কখন কখন কমিয়াও যায়।

কিন্তু দৈহিক শ্রমের দ্বারা ক্রমবর্দ্ধমান উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এক বিরাট অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে, যাহার আঘাতে ধনতান্ত্রিক সমাজ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। একদিকে অতুল ধন সম্পত্তি ও অগাধ উৎপন্ন দ্রব্য---ইহা খরিদ্দারগণ আয়ত্ত্ব করিতে সক্ষম হয় না—অন্যদিকে সমাজের অধিক সংখ্যক লোকই দিন মজুরী খাটিয়া সর্ব্বহারা শ্রমিকে পরিণত হয়, কাজেই তাহাদের দ্বারাও এই উৎপন্ন দ্রব্য অধিকার করা বা ভোগ করা সম্ভব হয় না; সমাজ তুই অংশে বিভক্ত হয়—এক অংশে মুষ্টিমেয় অত্যধিক ধনিকগণ, অন্য অংশে অত্যধিক অভাবগ্রস্ত অধিক সংখ্যক লোক। দিন দিন এই অবস্থা অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় ও অসমীচিন হইয়া উঠে। ইহা কিন্তু দূর করা সম্ভব এবং অবশ্য উচিত। এমন এক নূতন সামাজিক অবস্থার উদ্ভব করিতে হইবে— যেখানে বর্ত্তমানের শ্রেণী-বৈষম্য সম্পূর্ণ লোপ পাইবে এবং যেখানে কিছুদিনের অবস্থান্তর কালের পর (আর্থিক কষ্ট তখন কিছু বাড়িলেও, পরম নৈতিক লাভ হইবে) সুবৃহৎ উৎপাদন শক্তি সমূহের সুশৃঙ্খল ব্যবহার ও প্রত্যেকের উপর সমান দায়িত্ব আরোপ দ্বারা সমাজের প্রত্যেকেই দৈহিক ও মানসিক কৃষ্টি সাধনার সমান সুযোগ পাইবে। ইহা মোটেই কল্পনার বস্তু নয়,

বাস্তব ক্ষেত্রেই হওয়া সম্ভব—বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীও আজ সর্ব্বত্র এই নূতন অবস্থা আনয়নের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে। তাহাদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

লণ্ডন, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস

৩০শে এপ্রিল, ১৮৯১।

# মজুরী ও মূলধন

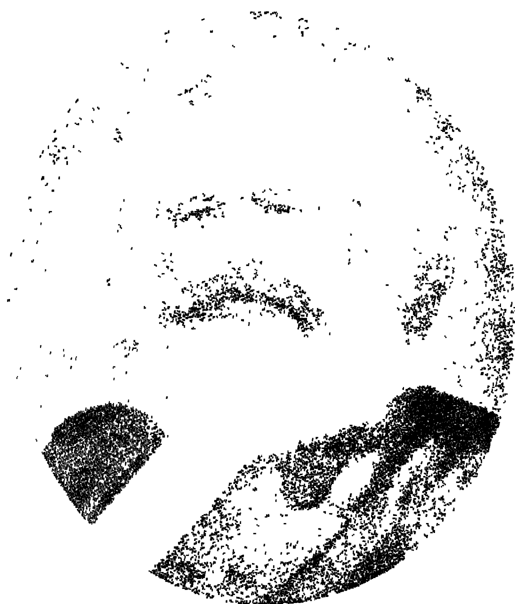
## ১

বর্ত্তমান শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতীয় সংগ্রাম সমূহের বাস্তব ভিত্তিস্বরূপ অর্থনৈতিক অবস্থার বিশদ আলোচনা আমরা করি নাই, এই অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। কোন রাজনৈতিক হাঙ্গামার সময় যখন অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন অবস্থায় দেখা দিয়াছে, মাত্র তখনই আমরা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছি।

আধুনিক ইতিহাসে শ্রেণী সংগ্রামের গতি নির্ণয় করিয়া ও দৈনন্দিন ঐতিহাসিক ঘটনাকে বিশদভাবে আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলাম যে, ফ্রান্সে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে শ্রমিক শ্রেণীকে বিধ্বস্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুপক্ষ বুর্জ্জোয়া সাধারণতান্ত্রিকগণও পরাজিত হইয়াছিলেন—ফ্রান্সে 'অনেষ্ট রিপাব্লিকের' জয়ের সমকালেই ফেব্রুয়ারী বিপ্লবে যোগদানকারী ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির পতন হইয়াছিল—ও সর্ব্বশেষে বিপ্লব পরাজিত হইবার

পর সারা ইউরোপ পুনরায় ব্রিটীশ ও রুশীয় সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। প্যারির জুন-বিদ্রোহ, ভিয়েনার পতন, ১৮৪৮ সালের বার্লিনের নবেম্বর-বিদ্রোহ, পোলাণ্ড ইটালী ও হাঙ্গেরীর স্বাধীনতা লাভের উদ্দাম চেষ্টা, আয়র্লণ্ডে খাদ্যাভাব—এই গুলির মধ্য দিয়াই আমরা বুর্জ্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের জলন্ত চিত্র দেখিয়াছিলাম। ইহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হইয়াছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী জয়লাভ করিতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবমূলক জাগরণ নষ্ট হইতে বাধ্য—যদিও সব সময়ে এই প্রচেষ্টাগুলি বাহ্যতঃ শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে না; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বহারা বিপ্লব পৃথিবী-ব্যাপী সমরে সামন্তযুগের বিপ্লব-বিরোধীগণকে না আহ্বান করিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকল প্রকার সামাজিক পরি-বর্ত্তনের কথা কাল্পনিক ভিন্ন কিছুই নয়। ইউরোপীয় ইতিহাসে বেলজিয়ম ও সুইজারলণ্ডের অবস্থা দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হইতে হয়; বেলজিয়মে বুর্জ্জোয়া রাজতন্ত্র ও সুইজারলণ্ডে বুর্জ্জোয়া সাধারণতন্ত্র অবস্থিত—এই দুইটী সাম্রাজ্যই নিজেদের শ্রেণীসংগ্রাম তথা ইউরোপীয় বিপ্লবের প্রভাব হইতে মুক্ত মনে করে।

পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে, শ্রেণীসংগ্রাম কিরূপভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ১৮৪৮ সালের বিরাট রাজনৈতিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিরূপ অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি



কার্ল মার্কস্

১৮১৮—১৮৮৩।

করিয়া বুর্জ্জোয়াগণ ও তাঁহাদের শ্রেণীরাজ বর্ত্তমান, কিরূপ অর্থনৈতিক অবস্থাই বা শ্রমিকের দাসত্বের কারণ—তাহা সম্যক আলোচনা করিবার এখনই প্রশস্ত সময়।

উপরি উক্ত সমস্যা দুইটিকে প্রধান তিনভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করিব :—১। মজুরী ও মূলধনের সম্পর্ক ; শ্রমিকের দাসত্ব ; পুঁজিপতির প্রভুত্ব। ২। বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক অবস্থায় মধ্যবুর্জ্জোয়া শ্রেণীর ও তথাকথিত বার্গারদের অবশ্যম্ভাবী পতন। ৩। জগতের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্য ইংলণ্ড কর্ত্তৃক অপরাপর ইউরোপীয় জাতির উপর প্রভুত্ব ও বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর শোষণ। *

যথা সম্ভব সরল ভাষায় সহজ করিয়া আমরা লিখিতে চেষ্টা করিব, যাহাতে অর্থনীতিশাস্ত্রের সহিত বিন্দুমাত্র পরিচয় না থাকিলেও ইহা বোধগম্য হয় এমন কি প্রত্যেক শ্রমিকই ইহা বুঝিতে পারে ; জার্ম্মাণীতে অতি সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও সকলের বিরাট অজ্ঞতা ও চিন্তাধারার অসামঞ্জস্য বর্ত্তমান। এ বিষয়ে বুর্জ্জোয়াগণ ও তাহাদের পৃষ্ঠপোষক হইতে আরম্ভ করিয়া আদিম সাম্যবাদী ভ্রাম্যমান-মেষপালক ও অখ্যাতনামা রাজনীতিক-গণ কেহই কাহারও চেয়ে কম নন্।

* কিন্তু দুঃখের বিষয়, মার্ক্স্ উপরি-উক্ত তিনটী প্রবন্ধ শেষ করেন নাই। কেবলমাত্র 'মজুরী ও মূলধনের সম্পর্ক' নামে প্রথম পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছিলেন।

২

## মজুরী কাহাকে বলে ও কিরূপে তাহা নিরূপিত হয়?

কোন মিল বা কারখানায় যাইয়া কয়েকজন শ্রমিককে যদি আমরা প্রশ্ন করি "তোমরা কত মজুরী পাও?" এক জন বলিবে, "আমি মনিবের নিকট হইতে দৈনিক এক টাকা পাই।" অন্য এক জন বলিবে, "আমি মনিবের নিকট হইতে দৈনিক দেড় টাকা মজুরী পাই।" অন্যান্য শ্রমিকগণও এইভাবে উত্তর করিবে। বিভিন্ন শ্রমশিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রমিক কোন বিশেষ কার্য্য সমাপনের জন্য মালিকের নিকট হইতে যে অর্থ পায় তাহাই তাহারা উল্লেখ করে; যেমন এক গজ কাপড় বুনানীর মজুরী বা এক পাতা টাইপ করার মজুরী। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময় কাজ করার জন্য অথবা কোন একটা মাল তৈয়ারী করার জন্য পুঁজিপতি শ্রমিককে যে অর্থ দেয় তাহাই তাহার মজুরী।

পুঁজিপতি অর্থের দ্বারা শ্রমিকের শ্রম ক্রয় করে এবং শ্রমিকও অর্থের জন্য তাহার শ্রম পুঁজিপতির নিকট বিক্রয় করে। প্রথম দৃষ্টিতে এইরূপ মনে হয় বটে আসলে

কিন্তু অন্যরূপ ; শ্রমিক পুঁজিপতির নিকট তাহার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। পুঁজিপতি দিন, সপ্তাহ, মাস হিসাবে শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে এবং এই শ্রমশক্তি ক্রয় করিয়া পুঁজিপতি শ্রমিককে নির্দ্দিষ্ট সময় খাটিতে বাধ্য করে। পুঁজিপতি যেমন এক টাকায় দৈনিক একজন শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে, সেই এক টাকাতেই সে অন্য কোন বস্তু, যেমন চারি সের চিনি বা অন্য পণ্য ক্রয় করিতে পারে। চারি সের চিনি এক টাকায় ক্রয় করা মানে চারি সের চিনির বাজার-মূল্য (price) এক টাকা। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, শ্রমিকের শ্রমশক্তিও চিনির মত একটী পণ্য, প্রথমটির বাজার-মূল্য ঘণ্টা অনুসারে ও দ্বিতীয়টীর বাজার-মূল্য ওজন অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রমিক তাহার পণ্য শ্রমশক্তি, পুঁজিপতির পণ্য অর্থের বিনিময়ে বদল করে ও এই বিনিময় ব্যাপারও নির্দ্দিষ্ট হার অনুযায়ী নির্দ্ধারিত হয় (অর্থাৎ এত ঘণ্টা শ্রমশক্তির বিনিময়ে এত টাকা মজুরী)। পুঁজিপতি কোন শ্রমিকের দৈনিক মজুরী বাবদ এক টাকা প্রদান করে অর্থাৎ এক টাকা পরিমাণ চাউল, ডাল, কয়লা, কাপড় প্রভৃতি জীবন ধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করে বা আরো সোজা কথায় শ্রমিক তাহার শ্রমশক্তির বিনিময়ে এক টাকা পরিমিত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি পায়। কোন পণ্যের বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া

যায়, তাহাই তাহার বাজার-মূল্য। কাজেই দেখা যাইতেছে যে মজুরী হইতেছে শ্রমিকের শ্রমশক্তির বাজার-মূল্য; সাধারণতঃ ইহাকে শ্রমিকের কাজের (Work) বাজার-মূল্য হিসাবে ধরা হয়। রক্তমাংসময় মানুষের শরীরে শ্রমশক্তিরূপ যে বিশেষ পণ্য বর্ত্তমান, মজুরী হইতেছে তাহারই বাজার-মূল্য।

একজন তাঁতির বিষয় আলোচনা করা হউক। পুঁজিপতি তাহাকে তাঁত, সূতা প্রভৃতি সরবরাহ করে, তাঁতি কাজ আরম্ভ করিয়া সেই সূতা হইতে কাপড় তৈয়ারী করে। পুঁজিপতি সেই কাপড় লইয়া মনে করুন তাহা পাঁচ টাকায় বিক্রয় করে। এখন প্রশ্ন, যে এই পাঁচ টাকায় তাঁতির কোন ভাগ আছে কি না? না, বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় তাঁতির ইহাতে কোন ভাগ নাই। কেননা কাপড় বিক্রয় হইবার বহু পূর্ব্বেই এমন কি কাপড় তৈয়ারী হইবার পূর্ব্বেই তাঁতি তাহার মজুরী পায়। এই কাপড় বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা হইতে পুঁজিপতি তাঁতিকে বেতন দেয় না, পক্ষান্তরে পুঁজিপতির পুঁজি হইতেই তাহাকে বেতন দেয়। তাঁতিকে তাঁত ও সূতা এমনি সরবরাহ করা হয় এগুলি তাহার শ্রমশক্তির বিনিময়ে দেওয়া হয় না, এই তাঁত ও সূতাতে তাঁতির কোন অধিকার নাই। যে কাপড় তৈয়ারী হয়, হয়ত সেই কাপড়ের খরিদ্দার জুটে না বা তাহা বিক্রয় করিয়া মজুরীর টাকা পাওয়া

যায় না অথবা অত্যন্ত অধিক লাভে সেই কাপড় বিক্রীত হয়, যে কোন অবস্থাই হউক না কেন ইহার সহিত তাঁতির কোন সংস্রব নাই। পুঁজিপতি যেমন তাহার সঞ্চিত মূলধনের একভাগ হইতে সূতা ও তাঁত ক্রয় করে সেই রূপ মূলধনের অন্যভাগ দ্বারা তাঁতির শ্রমশক্তি ক্রয় করে। পুঁজিপতি সূতা, তাঁত, শ্রমশক্তি, কারখানার ঘর প্রভৃতি একত্র করিয়া পণ্য (কাপড়) পায়; উৎপন্ন পণ্যে যেমন তাঁত বা সূতার কোন ভাগ থাকিতে পারে না, সেইরূপ হতভাগ্য তাঁতিরও কোন ভাগ নাই।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রমিক যে পণ্য উৎপন্ন করে, সেই উৎপন্ন পণ্যের ভাগ স্বরূপ তাহার মজুরী নয়; পরন্তু উৎপন্নশীল শ্রমশক্তির বাজার-মূল্য হইতেছে মজুরী।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, শ্রমশক্তি একটী পণ্য এবং ইহা শ্রমিক পুঁজিপতির নিকট বিক্রয় করে। কেন সে ইহা বিক্রয় করে? জীবন ধারণের জন্য সে ইহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। শ্রমশক্তির ব্যবহারিক শ্রম সে স্বীয় জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাইবার আশায় বিক্রয় করে। তাহার প্রচেষ্টা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখার উপায় মাত্র। সে বাঁচিয়া থাকার জন্যই পরিশ্রম করে। সে এই শ্রমকে নিজের জীবনের অংশস্বরূপ মনে করে না বরং ইহা তাহার জীবনের ত্যাগেরই নামান্তর। অন্যের নিকট হস্তান্তর করিতে পারে ইহা এরূপ একটী পণ্য।

এই শ্রম প্রচেষ্টার ফলে সে যাহা উৎপন্ন করে, তাহাও তাহার প্রচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। সে যে সিল্ক বুনে, বা খনি হইতে স্বর্ণ তুলে বা রাজ অট্টালিকা তৈয়ারী করে—ইহা কিছুই নিজের জন্য নহে। সে ইহার বিনিময়ে কেবল মজুরী পায় এবং ঐ সিল্ক, স্বর্ণ বা অট্টালিকা সম্ভবতঃ তাহার নিকট সূতির জামা, কয়েকটা পয়সা বা একটী কুঁড়ে ঘরের আকার লইয়া দেখা দেয়। যে শ্রমিক বার ঘণ্টা ধরিয়া তাঁত বুনে, সূতা কাটে, বাড়ী তৈয়ারী করে, পাথর বহে, এই বার ঘণ্টায় তাহার জীবনের কোন প্রকার স্ফূরণ হয় না—অন্য পক্ষে এই বার ঘণ্টা মেহনতের পরই তাহার জীবন আরম্ভ হয়, সে খাওয়া দাওয়া, স্ফূর্ত্তি ও গল্প গুজব করে। পরের বার ঘণ্টার এই সকল সুখ সুবিধা পাওয়া ব্যতীত প্রথম বার ঘণ্টার শ্রমের কোন মূল্যই নাই।

শ্রমশক্তি কিন্তু বরাবর এইরূপ পণ্য হিসাবে বিক্রীত হইত না। কেবল মজুরীর জন্য শ্রমিক শ্রম করিত না। বলদ যেরূপ কৃষককে কাজ দেয়, সেইরূপ ক্রীতদাসও এক সময়ে প্রভুকে শ্রমশক্তি দান করিত। শ্রমশক্তি সম্পন্ন ক্রীতদাস চিরকালের জন্য প্রভুর নিকট বিক্রীত হইত ও তাহা সাধারণ পণ্য হিসাবে এক প্রভু হইতে অন্য প্রভুর নিকট হস্তান্তরিত হইত। সে নিজেই ছিল একটি পণ্য, কাজেই তাহার শ্রম-শক্তি আর পৃথক্ পণ্য হিসাবে লক্ষিত হইত না। সেকালে সার্ফ (serf) তাহার শ্রমশক্তির একাংশ মাত্র বিক্রয়

করিত। সে ইহার জন্য জমির মালিকের নিকট হইতে মজুরী পাইত না বরং মালিকই তাহার নিকট হইতে নজরাণা আদায় করিত। সার্ফ ছিল জমি-সংলগ্ন সম্পত্তি, কাজেই জমির মালিককে সে কাজ দিত। অন্য দিকে, আজকাল স্বাধীন মজুর নিজেকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বিক্রয় করে। সে দিনের পর দিন তাহার শ্রমিক জীবনের আট, দশ, বার ঘণ্টা পুঁজি-পতির নিকট সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে। স্বাধীন মজুর জমি বা জমির মালিকের সম্পত্তি নহে, কেবল আট, দশ, বার ঘণ্টার জন্য পুঁজিপতির সম্পত্তি। শ্রমিক খুসীমত তাহার মনিব পরিবর্ত্তন করে—মনিবও তাহার ইচ্ছানুরূপ লাভ না পাইলে শ্রমিককে বরখাস্ত করে। কিন্তু শ্রমিক, যাহাকে মজুরী খাটিয়াই খাইতে হয়, সে পুঁজিপতি শ্রেণীকে বাদ দিয়া বাঁচিতে পারে না। সে কোন বিশেষ পুঁজিপতির সম্পত্তি না, হইলেও সে পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পত্তি ও এই পুঁজিপতির শ্রেণীর কাহারও কাছে সে নিজেকে বিক্রয় করে।

মজুরী ও মূলধন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মজুরী নির্ণয়ের অতি সাধারণ অবস্থাগুলি আমরা একে একে আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে মজুরী হইতেছে শ্রম-শক্তিরূপ পণ্যের বাজার-মূল্য। অন্যান্য পণ্যের বাজার মূল্য যে ভাবে নির্দ্ধারিত হয়, সেই একই নিয়ম অনুযায়ী শ্রমশক্তির বাজার-মূল্য স্থিরীকৃত হয়।

( ৩ )

## কীরূপে পণ্যের বাজার-মূল্য নির্দ্ধারিত হয়?

খরিদ্দার ও বিক্রেতাগণের প্রতিযোগিতার দ্বারা, চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্কের দ্বারা ইহা নির্দ্ধারিত হয়। যে প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া পণ্যের বাজার-মূল্য স্থিরীকৃত হয় তাহা ত্রিবিধ।

( ১ ) বিভিন্ন বিক্রেতা এই পণ্য বিক্রয় করে, কাজেই যে বিক্রেতা সমমূল্যের ( equal value ) দ্রব্য সর্ব্বাপেক্ষা সস্তায় দিতে পারে, তাহার জিনিষই অধিক বিক্রয় হয় ও সে অন্যান্য বিক্রেতাগণকে বাজার হইতে তাড়াইতে পারে। বিক্রেতাগণ অধিক বিক্রয়ের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, প্রত্যেক বিক্রেতাই যতদূর সম্ভব বেশী বিক্রয় করিতে ও সম্ভব হইলে অন্যান্য বিক্রেতাগণকে দূর করিয়া একাই বিক্রয় করিতে চায়। কাজেই একে অন্যের অপেক্ষা সস্তায় বিক্রয় করে—এইরূপে বিক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি দ্বারা বিক্রয়ার্থ আনীত পণ্যের বাজার-মূল্য কমিয়া যায়।

( ২ ) আবার খরিদ্দারগণের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকায় পণ্যের বাজার-মূল্য বাড়িয়া যায়।

( ৩ ) খরিদ্দার ও বিক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা

বর্ত্তমান। খরিদ্দার চায় যতদূর সম্ভব সস্তায় কিনিতে ও বিক্রেতা চায় যতদূর সম্ভব উচ্চ মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিতে। খরিদ্দারগণের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার উপরই নির্ভর করে খরিদ্দার ও বিক্রেতার প্রতিযোগিতার ফল। খরিদ্দার ও বিক্রেতা ঠিক যেন যুধ্যমান দুই দল সৈন্য, আবার এই দুই দলের প্রত্যেকের মধ্যেই অন্তর্যুদ্ধ বর্ত্তমান—কাজেই ইহার মধ্যে যে দলে অন্তর্যুদ্ধ অপেক্ষাকৃত কম, সেই দলই অপরকে হারাইয়া জয়লাভ করে।

মনে করুন, বাজারে একশত বস্তা তূলা বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছে এবং এক হাজার বস্তা তূলা কিনিবার খরিদ্দার রহিয়াছে—এমতাবস্থায় খরিদ্দারগণের মধ্যে প্রবল প্রতি-যোগিতা দেখা যাইবে,—প্রত্যেকেই অন্ততঃ এক বস্তা তূলা ও সম্ভব হইলে একশত বস্তা তূলাই কিনিতে চাহিবে। এরূপ অবস্থা মোটেই কাল্পনিক নহে। (আমরা দেখিয়াছি যে তূলার বাজারে ঘাট্‌তি পড়িলে কয়েকজন পুঁজিপতি একত্রে মিলিয়া কেবল একশত বস্তা তূলা নহে, সারা জগতের তূলার সরবরাহই কিনিয়াছে।) এক্ষেত্রে একজন খরিদ্দার অন্যের অপেক্ষা বেশী বাজার-মূল্য দিয়া তূলা কিনিবে। বিক্রেতারা দেখে যে তাহাদের একশত বস্তা তূলা নিশ্চয়ই বিক্রয় হইবে ও অপরপক্ষে খরিদ্দারদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা বর্ত্তমান —কাজেই তাহারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ না করিয়া যথাসম্ভব একযোগে বাজার দর বাড়াইতে চেষ্টা করে। এই

সময়ে আমরা বিক্রেতাদের মধ্যে যথেষ্ট শান্তি দেখিতে পাই, খরিদ্দারগণের কাছে তাহারা এক হইয়া দাঁড়ায় ও যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মনের মত দর উঠে ততক্ষণ খরিদ্দারগণের শত কাকুতি মিনতিতেও কর্ণপাত করে না।

মোট কথা, সরবরাহ অপেক্ষা কোন পণ্যের চাহিদা বেশী হইলে, বিক্রেতাগণের মধ্যে খুব অল্প প্রতিযোগিতা দেখা যায় বা কোন কোন ক্ষেত্রে মোটেই প্রতিযোগিতা থাকে না; ঠিক যে হারে বিক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমিতে থাকে, সেই হারেই খরিদ্দারগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িতে থাকে, ফলে পণ্যের বাজার-মূল্য বাড়িয়া যায়।

কিন্তু সচরাচর ইহার বিপরীত ব্যাপারই পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ হয় অনেক বেশী কাজেই বিক্রেতাগণের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা ও খরিদ্দারের অভাব দেখা যায় এবং অসম্ভব কম বাজার-মূল্যে পণ্য বিক্রীত হয়।

বাজার-মূল্য এরূপ কম হওয়ার বা বাড়িয়া যাওয়ার মানে কি? অধিক বাজার-মূল্য ও অল্প বাজার-মূল্যই বা কাহাকে বলে? ধূলিকণাকেও অনুবীক্ষণযন্ত্রে বড় দেখায় আবার বিশাল গম্বুজও পর্ব্বতের তুলনায় নেহাৎ নীচু। যদি চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্কের উপরেই বাজার-মূল্য নির্ভর করে, তাহা হইলে এখন প্রশ্ন উঠে যে কিরূপে চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হয়?

আসুন, একজন নাগরিকের সহিত আলাপ করি। মুহূর্ত্ত-মাত্র চিন্তা না করিয়াই সে মহা বিজ্ঞের মত আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবে। সে গম্ভীরভাবে বলিবে, "যে পণ্য উৎপাদন করিতে আমার ১০০৲ টাকা খরচ পড়িয়াছে, সেই পণ্য যদি আমি ১১০৲ টাকায় বিক্রয় করি, তাহা হইলে আমি সৎপথে থাকিয়া যুক্তিযুক্ত উপায়ে ১০৲ টাকা ন্যায্য লাভ করিলাম। এবং যদি উহা বিক্রয় করিয়া আমি ১২০৲।১৩০৲ পাই, আমার লাভ কিছু বেশী হইল বটে কিন্তু যদি আমি দুইশত টাকায় বিক্রয় করি, ত অত্যধিক লাভ করিলাম।" এখন প্রশ্ন উঠে যে, লাভের মাপকাঠি কি? পণ্য-উৎপাদনের খরচাই তাহার মাপকাঠি। পণ্যের উৎপাদন-খরচের বেশী বাজার-মূল্য পাইলেই তাহার লাভ হইল ও কম পাইলেই তাহার লোকসান হইল। এই উৎপাদন-খরচাই তাহার লাভ লোকসান স্থির করে।

আমরা দেখিয়াছি যে, চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্ত্তন-শীল সম্পর্কের উপরেই বাজার-মূল্যের উঠা-নামা নির্ভর করে। কোন পণ্যের বাজার-মূল্য উঠিলে ( কম সরবরাহের জন্য বা অত্যধিক চাহিদার জন্য ) বুঝিতে হইবে যে নিশ্চয়ই অন্য কোন পণ্যের বাজার-মূল্য সেই পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে। মনে করুন, এক গজ সিল্কের বাজার-মূল্য পাঁচ টাকা হইতে ছয় টাকা উঠিল অর্থাৎ সিল্কের তুলনায় টাকার বাজার-মূল্য নামিয়া গেল ও যে সব পণ্যের বাজার-মূল্য পূর্ব্বের

অবস্থাতেই আছে তাহাদেরও বাজার-মূল্য সিল্কের তুলনায় কমিয়া গেল। একই পরিমাণ সিল্ক পাইবার জন্য তাহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ পণ্য বিনিময় করিতে হইবে। কোন পণ্যের বাজার-মূল্য বাড়িয়া গেলে কী হয়? ক্রমাগত অধিক পরিমাণ মূলধন সেই শিল্পে নিযুক্ত করা হয়, যতক্ষণ না অত্যুৎপাদনের জন্য এই বেশী লাভ পাওয়া থামে এমন কি মধ্যে মধ্যে লোকসানও পড়ে।

অপর পক্ষে, কোন পণ্যের বাজার-মূল্য সেই পণ্যের উৎপাদন-খরচের অপেক্ষা নামিয়া গেলে, সেই পণ্যের উৎপাদনে মূলধন খাটান কমাইয়া দেওয়া হয়। ফলে তাহার সরবরাহ পুনরায় চাহিদা মাফিক হয় ও তাহার বাজার-মূল্য উৎপাদন-খরচের সমান দাঁড়ায়; অথবা চাহিদা সরবরাহ অপেক্ষা বেশী হয় ও বাজার-মূল্যও উৎপাদন-খরচের বেশী দাঁড়ায়। (কেবলমাত্র যে সব শিল্প বর্ত্তমানে অপ্রচলিত হইয়াছে বা হইতেছে, সেই ক্ষেত্রেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।) **কারণ প্রত্যেক পণ্যের চলতি বাজার-মূল্য সব সময়েই উৎপাদন খরচের বেশী বা কম থাকে।**

প্রায়ই দেখা যায় যে মূলধন ক্রমাগত এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে যাতায়াত করে; অধিক বাজার-মূল্য মূলধন টানে আবার বাজার-মূল্য নামিয়া গেলে মূলধন চলিয়া আসে।

আমরা আরও দেখাইতে পারি যে, চাহিদাও সরবরাহের

ন্যায় উৎপাদন-খরচের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইতে দূরে যাইতেছি।

আমরা এই মাত্র দেখিয়াছি যে চাহিদা ও সরবরাহের উঠা-নামা কিরূপে পণ্যের বাজার-মূল্যকে উৎপাদন-খরচের সমান করিয়া আনে। পণ্যের যথার্থ বাজার-মূল্য কিন্তু সকল সময়েই উৎপাদন-খরচের বেশী বা কম থাকে, এই উঠা-নামা পরস্পরের সমতা রক্ষা করে; কাজেই কোন নির্দ্দিষ্ট কালে শিল্পের উঠা-নামাকে গণ্য করিয়া আমরা দেখি যে সকল পণ্যই উৎপাদন-খরচ অনুযায়ী বিনিময় করা হয় অর্থাৎ এই উৎপাদন-খরচই পণ্যের বাজার-মূল্য স্থির করে।

উৎপাদন-খরচের দ্বারাই বাজার-মূল্য নির্দ্ধারিত হয়—এই ব্যাপারটী কিন্তু বুর্জ্জোয়া অর্থনীতিকগণের দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। তাহাদের মত যে, পণ্যের গড়পরতা বাজার-মূল্য উৎপাদন-খরচার সমান এবং ইহাই নিয়ম; যে ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক। আমরা ঠিক সেইরূপ দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি যে তাহাদের এই তথাকথিত আকস্মিকতাই চিরন্তন নিয়ম এবং যেখানে বাজার-মূল্য উৎপাদন-খরচের সমান তাহাই একেবারে আকস্মিক। ইহাতে বুর্জ্জোয়া সমাজ ভীতিগ্রস্ত হন ও ভূমি-কম্পের সময়ের ন্যায় তাঁহাদের পায়ের তলায় পৃথিবী কাঁপিতে থাকে।

মোটের উপর, পণ্যের বাজার-মূল্য তাহার উৎপাদন-

খরচার দ্বারা এইভাবে নির্দ্ধারিত হয় যে, যে সময়ের মধ্যে যে পরিমাণে বাজার–মূল্য উৎপাদন-খরচার বেশী হয়, ঠিক সেই পরিমিত সময়ে ও সেই পরিমাণে বাজার-মূল্য উৎপাদন-খরচের কম হয়। অবশ্য এই নিয়ম কোন এক বিশেষ শিল্প বিভাগ সম্বন্ধে প্রযোজ্য —সেই শিল্প বিভাগের কেবল একটী মাত্র পণ্যের সম্বন্ধে ইহা সত্য নাও হইতে পারে। সেইরূপ ইহা একজন কারিগরের পক্ষে সত্য না হইলেও এক শ্রেণীর কারিগরের পক্ষে যে সত্য, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

উৎপাদন খরচের অনুপাতে বাজার-মূল্য নির্দ্ধারণ করা ও শ্রম-কালের দ্বারা বাজার-মূল্য নির্দ্ধারণ করা একই কথা; কারণ উৎপাদন-খরচা বলিতে বুঝায়, (১) কাঁচা মাল, ও যন্ত্রপাতির ঝড়তি পড়তি (Wear and tear)—এগুলি উৎপন্ন করিতেও শ্রম-কালের প্রয়োজন হইয়াছে (২) শ্রম—ইহাও সময় দ্বারা মাপা হয়।

## ৪

আবার যে সকল সাধারণ নিয়ম দ্বারা পণ্যের বাজার-মূল্য স্থিরীকৃত হয়, সেই একই নিয়ম দ্বারা শ্রম-শক্তির বাজার-মূল্য অর্থাৎ মজুরী স্থির হয়।

চাহিদা ও সরবরাহের সম্পর্ক অনুযায়ী শ্রমশক্তির খরিদ্দার পুঁজিপতি ও শ্রমশক্তির বিক্রেতা মজুরগণের প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করিয়া মজুরী বাড়ে বা কমে। শ্রমশক্তির বাজার-মূল্যের উঠা-নামা অন্যান্য পণ্যের বাজার মূল্যের উঠা-নামার ন্যায় একই নিয়ম দ্বারা চালিত হয় অর্থাৎ ইহার উৎপাদন-খরচা ও ইহার উৎপাদনে কতখানি সময় লাগিয়াছে তাহার দ্বারা নিরূপিত হয়।

তাহা হইলে এখন প্রশ্ন উঠে যে শ্রম-শক্তির উৎপাদন-খরচ কী? (১) মজুরকে কর্ম্মক্ষম রাখার খরচা—(২) ও তাহাকে মজুর হিসাবে তৈরী করার খরচ—ইহাই শ্রমশক্তির উৎপাদন খরচ।

যে মজুরের শিক্ষানবিশী অবস্থা যত অল্প তাহাকে মজুর হিসাবে তৈরী করিতে তত অল্প খরচ লাগে কাজেই সেইরূপ মজুরের মজুরী তত অল্প। আবার যে সমস্ত শিল্পে এমন সব মজুর প্রয়োজন—যাহাদের কোন বিশেষ শিক্ষার দরকার নাই, কেবল দৈহিক শক্তিই যথেষ্ট, তাহাদের উৎপাদন-খরচ

অপেক্ষাকৃত কম, কোন রকমে বাঁচিয়া থাকার জন্য খরচ দিলেই যথেষ্ট। কাজেই তাহার শ্রমের বাজার-মূল্য মাত্র জীবন-ধারণের উপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যের উপর নির্ভর করে।

অবশ্য আর এক বিষয় আমাদের ভুলিলে চলিবে না। কারিগর তাহার পণ্যের বাজার-মূল্য নির্দ্ধারণের সময় যেমন যন্ত্রপাতির ঝড়তি পড়তিকে উৎপাদন-খরচার মধ্যে গণ্য করে (অর্থাৎ তাহার পঞ্চাশ টাকা দামের কোন যন্ত্র যদি পাঁচ বৎসরে সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সে সেই অনুপাতে প্রতি বৎসরে উৎপাদন- খরচার মধ্যে আরও দশ টাকা বেশী ধরে) সেইরূপ শ্রমশক্তির খরিদ্দারও যাহাতে মজুরকুল বজায় থাকে, যাহাতে বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য মজুরের স্থান সবল ও যুবক মজুর গ্রহণ করে সেই দিকে দৃষ্টি রাখে। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে মজুর তাহার কাছে শ্রম-শক্তি বিক্রয় করুক ইহাই পুঁজিপতির ইচ্ছা।

৫

প্রত্যেক পণ্যের বাজার-মূল্য নির্দ্ধারণ ও সেই সঙ্গে মজুরীর বাজার-মূল্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মগুলি অবগত হইয়া আমরা এইবার গভীরভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিব।

কাঁচা মাল, যন্ত্রপাতি, জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যাহা দ্বারা নূতন কাঁচা মাল, নূতন যন্ত্রপাতি, ও নূতন দ্রব্যাদি উৎপাদন হয়—এগুলি মূলধনের অন্তর্গত। ইহাদের প্রত্যেক-টীই আবার শ্রম, শ্রমফল ও সঞ্চিত শ্রম দ্বারা উৎপন্ন হয়। সঞ্চিত শ্রম যাহা নূতন উৎপাদনে সাহায্য করে তাহাও মূলধনের অন্তর্গত। অর্থনীতিকগণের ইহাই মত।

যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি নিগ্রোদাস কাহাকে বলে, তাহা হইলে কালা আদ্‌মীকে নিগ্রোদাস বলে—এইরূপ সংজ্ঞায় আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না।

পক্ষান্তরে, নিগ্রো নিগ্রোই, কেবল বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া সে দাসত্ব গ্রহণে বাধ্য হয়। সেইরূপ, তাঁত কাপড় বুনানীর যন্ত্রবিশেষ, কেবল বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া ইহা মূলধনরূপে দেখা দেয়। সেই অবস্থা বাদ দিলে ইহা যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে যেমন, স্বর্ণও সব সময় মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হয় না। উৎপাদন-ব্যাপারে যেমন মানুষ প্রকৃতির

সহিত সম্পর্কযুক্ত, সেইরূপ তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাহারা পরস্পরের সাহচর্য্যে কার্য্য করিয়া ও পরস্পরের কর্ম্মশক্তির বিনিময় দ্বারাই দ্রব্য উৎপন্ন করে। তাহারা পরস্পরের সহিত কতকগুলি সর্ত্তে ও সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়—এই সম্বন্ধগুলিই প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে ও তবেই উৎপাদন সম্ভব হয়।

উৎপাদকগণের সামাজিক সম্পর্ক ও যে অবস্থায় তাহারা পরস্পরের কর্ম্মশক্তি বিনিময় করে—এই দুইটী বিষয়েই বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। আগ্নেয়াস্ত্রের উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই যেমন সৈন্যদলের আভ্যন্তরীণ সংগঠন প্রণালী, সৈন্যদলভুক্তকরণ ও সৈন্যদলের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেইরূপ উৎপাদনের বাস্তব উপায়-গুলির আবিষ্কারের সমকালেই উৎপাদকগণের সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়। উৎপাদনের উপরি উক্ত সম্পর্কগুলির একত্র সমাবেশই সমাজ। আবার ঐতিহাসিক পরিণতির বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে বলিয়া প্রত্যেক সমাজেরই বিশেষত্ব দেখিতে পাই। ইতিহাসের ক্রম পরিণতির বিভিন্ন প্রকাশই বিভিন্ন সমাজরূপ পরিগ্রহ করে—যেমন প্রাচীন সমাজ, সামন্তযুগীয় সমাজ ও বুর্জ্জোয়া সমাজ।

মূলধনও উৎপাদনের একটী সামাজিক সম্পর্কবিশেষ—

ইহা বুর্জ্জোয়া সমাজের উৎপাদনের সম্পর্ক। জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল—মূলধনের এই কয়টী অংশই নির্দ্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় উৎপন্ন হইয়া নির্দ্দিষ্ট সামাজিক উপায়ে সঞ্চিত না হইলে, ইহাদের দ্বারা পুনরুৎপাদন সম্ভব হয় না।

কেবলমাত্র জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল বা শিল্প দ্রব্যাদিই মূলধনের অন্তর্গত নহে; মূলধন বলিতে বিনিময়-মূল্যও বুঝায়। ইহার প্রত্যেক অংশই আবার এক একটী পণ্য; তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শিল্প দ্রব্যাদির সমষ্টিই একমাত্র মূলধন নহে, পরন্তু পণ্য, বিনিময় হার ইত্যাদি সামাজিক সম্পত্তির প্রত্যেকটীর সমষ্টিও মূলধন। মূলধনের বাহ্যিক অবয়ব ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইলেও আসলে ইহার একটুও পরিবর্ত্তন ঘটে না, ইহার বিনিময় মূল্য পূর্ব্ববৎ থাকে যেমন, মূলধনের বাহ্যিক অবয়বে আমরা রেশমের পরিবর্ত্তে তূলা, শাক-শব্জীর পরিবর্ত্তে ধান্য, রেলের পরিবর্ত্তে ষ্টীমার ব্যবহার করিতে পারি।

যদিও মূলধন মাত্রেই পণ্য-সমষ্টি বা বিনিময়-মূল্য সমষ্টি, কিন্তু প্রত্যেক পণ্য-সমষ্টি বা বিনিময়-মূল্য সমষ্টি মূলধন নহে।

প্রত্যেক বিনিময়-মূল্য সমষ্টিই হইতেছে একটী বিনিময় মূল্য; প্রত্যেক বিনিময়-মূল্য আবার বহু বিনিময়-মূল্যের

সমষ্টি ; যেমন এক হাজার টাকার ( ইট, চূণ, দরজা, জানালা প্রভৃতি সমেত ) একটী বাড়ীর বিনিময়-মূল্য এক হাজার টাকা এবং এক পয়সা দামের এক টুকরা কাগজ দশটী এক-দশমাংশ পয়সার বিনিময়-মূল্যের সমষ্টি। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিনিময় করা যায় তাহাকে পণ্য বলে এবং যে নির্দ্দিষ্টহারে সেগুলির বিনিময় হয় তাহাকে বিনিময়-মূল্য বলে। এই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের পরিমাণের উপর তাহাদের পণ্যগুণের ( Character as commodities ) কিছু যায় আসে না—বিনিময়-মূল্য বা বাজার-মূল্য ঠিকই থাকে। একটী বৃক্ষ প্রকাণ্ডই হউক আর ক্ষুদ্রই হউক, ইহা একটী বৃক্ষই। অন্য পণ্যের পরিবর্ত্তে টন বা আউন্স যে হিসাবেই হউক লৌহ বিনিময় করি—ইহাতে বিনিময়-মূল্যরূপ পণ্যগুণের কোন পার্থক্য হয় না। কেবলমাত্র পরিমাণের অল্পাধিক্যবশতঃ বাজার-মূল্য বেশী বা কম হইয়া থাকে ( কিন্তু পণ্য পণ্যই থাকে )।

তাহা হইলে এখন প্রশ্ন উঠে যে, কিরূপে পণ্য-সমষ্টি ও বিনিময়মূল্য-সমষ্টি মূলধনে পরিবর্ত্তিত হয় ?

স্বতন্ত্র সামাজিক শক্তি হিসাবে বা সমাজের আংশিক শক্তি হিসাবে ইহা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখে ও জীবন্ত শ্রমশক্তির ( Living labour power ) সহিত সোজাসুজি বিনিময় দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয়। শ্রমশক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নাই এইরূপ একটী বিশেষ শ্রেণীর

অস্তিত্বের পূর্ব্ব-স্বীকারের উপরই মূলধন নির্ভর করে।

বর্ত্তমানের জীবন্ত শ্রমের উপর সঞ্চিত শ্রমের যে প্রভুত্ব—তাহাই সঞ্চিত শ্রমকে মূলধন পর্য্যায়ে আনে।

সঞ্চিত শ্রম জীবন্ত শ্রমকে নব উৎপাদনে সাহায্য করিলে ইহা মূলধন বলিয়া গণ্য হয় না, পক্ষান্তরে জীবন্ত শ্রম যখন সঞ্চিত শ্রমকে তাহার বিনিময়-মূল্য সংরক্ষণে বা বর্দ্ধিত করণে সাহায্য করে, তখনই সঞ্চিত শ্রম মূলধনের অন্তর্গত হয়। এখন প্রশ্ন এই যে মূলধনী ও মজুরের পণ্যের বিনিময় কী প্রকারে সাধিত হয়?

মজুর তাহার শ্রমশক্তির বিনিময়ে জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি পায় ও মূলধনী তাহার দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে মজুরের উৎপন্নশীল কর্ম্মশক্তি অর্থাৎ শ্রম বা শ্রমশক্তি গ্রহণ করে। মজুর যাহা খরচ করে তাহাই কেবল শোধ দেয় না, পক্ষান্তরে সে সঞ্চিত শ্রমের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়াইয়া দেয়। মজুর মূলধনীর নিকট হইতে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া কী করে? সে তখনই তাহা খরচ করিয়া ফেলে। কিন্তু যেইমাত্র আমি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিঃশেষ করিলাম, আমার কাছে সেগুলির আর কোন মূল্য রহিল না, যদি না আমি ঐ দ্রব্যাদি জীর্ণ করিয়া যতক্ষণ জীবিত থাকা যায় তাহার মধ্যে জীবন ধারণের জন্য নূতন

মূল্য সৃষ্টি করি, যেগুলি ঐ জীর্ণ মূল্যের স্থান গ্রহণ করে। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে মজুর এই পুনরুৎপাদনের শক্তিই মূলধনীর নিকট সমর্পণ করে ও এই উপায়ে নিজেকে হারায়।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্—একজন কৃষক দৈনিক এক টাকায় একটী মজুর নিযুক্ত করিল। মজুরটী ঐ এক টাকার পরিবর্তে সারাদিন কৃষকের জমি চাষ করিয়া তাহাকে দুই টাকার দ্রব্য প্রদান করিল অর্থাৎ কৃষক যে টাকা মজুরকে দিল, তাহাই পাইয়া সে সন্তুষ্ট হইল না—পরন্তু সে এক টাকায় মজুরের দুই টাকা মূল্যের শ্রম খরিদ করিল ও এক টাকাকে দুই টাকায় পরিণত করিল। অন্যপক্ষে, মজুর স্বীয় উৎপাদন ক্ষমতার বিনিময়ে কৃষকের নিকট হইতে যে এক টাকা পাইল—তাহার দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিল ও অল্পাধিক সময়ে তাহা নিঃশেষ করিল। তাহা হইলে এই এক টাকা দুই উপায়ে ব্যবহৃত হইল—মূলধনীর পক্ষে পুনরুৎপাদনে লাগিল, সে এক টাকায় দুই টাকা করিল; আর মজুরের পক্ষে কোনরূপ উৎপাদনে লাগিল না, কেননা সে ইহার পরিবর্তে যে দ্রব্য পাইল তাহা চিরকালের জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে ও তাহাকে পুনরুদ্ধার করা মানে কৃষকের সহিত পুনরায় ঐরূপ বিনিময় ব্যাপারে অবতীর্ণ হওয়া। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মূলধন ও মজুরী পরস্পর পরস্পরকে নির্দ্ধারণ করে ও উভয়ে উভয়কে

সৃষ্টি করে। মূলধন বলিলেই মজুরীর সূচনা বুঝা যায়, আবার মজুরীও মূলধনের আভাষ দেয়।

একটী সূতার কলে একজন মজুর কি কেবল সূতার দ্রব্য উৎপন্ন করে? না, সে মূলধন উৎপন্ন করে। সে এরূপ মূল্য উৎপন্ন করে যদ্দ্বারা তাহার শ্রম পুনরায় ক্রয় করিয়া নূতন মূল্য সৃষ্টি করা যায়।

শ্রমশক্তির সহিত বিনিময় দ্বারা ও মজুরী সৃষ্টি করিয়া মূলধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মজুরের শ্রমশক্তিও কেবলমাত্র মূলধনের সহিত বিনিময় করা হয় ও ইহা দ্বারা যে মূলধনের সে দাস তাহাকেই বাড়াইয়া দেয় ও শক্তিশালী করে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মূলধনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বহারা মজুর শ্রেণীও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মূলধনী ও মজুরের স্বার্থ তাহা হইলে একই, এই কথাই বুর্জ্জোয়া অর্থনীতিকগণ ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে তাহাই। মূলধনী মজুরকে না কাজ দিলে তাহার শুকাইয়া মরা ছাড়া গতি নাই। শ্রমশক্তিকে না ঠকাইলে (exploit) মূলধন নাশপ্রাপ্ত হয়, আবার শ্রমশক্তিকে ঠকাইতে হইলে মূলধনকে শ্রমশক্তি কিনিতেই হইবে। উৎপন্নশীল মূলধন যত তাড়াতাড়ি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই অনুপাতে শিল্প সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে, ব্যবসায় দ্রুত চলে ও মজুর ততই নিজেকে বিক্রয় করে। মজুরের নিম্নতম জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ-প্রণালী

উৎপন্নশীল মূলধনের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতি ও পরিণতিকে সাহায্য করে।

কিন্তু উৎপন্নশীল মূলধনের বৃদ্ধি কীরূপ? জীবন্ত-শ্রমের উপর সঞ্চিত-শ্রমের প্রভুত্বের বৃদ্ধি। মজুরীর দ্বারা বিরুদ্ধশক্তি মূলধনের যে অতিরিক্ত ধন উৎপন্ন হয়, তাহা পুরাতন মূলধনে গিয়া জমা হয় ও যাহাতে ভবিষ্যতে আরও বেশী অর্থ মূলধনে সঞ্চিত হইতে পারে সেই উপায়ে নিযুক্ত হয়।

মূলধনী ও মজুরের স্বার্থ একই বলার মানে এই যে তাহারা একই সম্পর্কের দুইটী দিক এবং পরস্পর পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে যেমন, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ উভয়ে উভয়কে সৃষ্টি করে। মজুরকে যতদিন মজুরী করিতে হইবে ততদিনই তাহাকে মূলধনের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই মজুর ও মূলধনীর তথাকথিত সমস্বার্থ।

মূলধন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মোট মজুরীর পরিমাণ বাড়ে ও মজুরের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অধিকসংখ্যক ব্যক্তির উপর মূলধনের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। খুব অনুকূল অবস্থায় উৎপন্নশীল মূলধন বাড়িলে কখনও কখনও মজুরের চাহিদা বাড়ে ও শ্রমশক্তির বাজার-মূল্য মজুরীও বাড়ে।

মনে করুন একটী বাড়ী, তাহা বৃহৎ হউক আর ক্ষুদ্র হউক —যতক্ষণ তাহার চতুর্দ্দিকের বাড়ীগুলি তাহারই মত বৃহৎ বা

ক্ষুদ্র থাকে, ততক্ষণ কোন বৈষম্য লক্ষিত হয় না কিন্তু যখনই তাহার পার্শ্বে একটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়, অমনই ইহাকে কুটীর সদৃশ মনে হয় এবং ইহার অধিবাসীদের সামাজিক মর্য্যাদা যে অপেক্ষাকৃত ন্যূন সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। আবার যদি আমাদের এই প্রথম বাড়ীটী :কাল-ক্রমে বা সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও যদি ঐ পার্শ্বের প্রাসাদটীও সমহারে বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে আমাদের প্রথম বাড়ীর অধিবাসীগণ পূর্ব্বের ন্যায়ই অসন্তোষ অনুভব করেন।

উল্লেখযোগ্যরূপে মজুরী বৃদ্ধি পাইলে বুঝিতে হইবে যে উৎপন্নশীল মূলধনও দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হইতেছে। উৎপন্ন-শীল মূলধনের দ্রুতগতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অর্থ, বিলাসিতা ও আনন্দ উপভোগের চাহিদা দ্রুত বাড়িয়া যায়। এই অবস্থায় মূলধনীদের বিলাসিতা ও আনন্দ উপভোগের চাহিদা এত বাড়িয়া যায় যে মজুরগণ তাহাদের আর যথাযথ তৃপ্তি-সাধন করিতে পারে না। সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থানু-যায়ী আমাদের অভাব ও বিলাসস্পৃহা সৃষ্টি হয় ও সমাজের আদর্শ অনুযায়ীই তাহা মাপা হয়।

তাহা হইলে, মজুরী কেবলমাত্র তাহার বিনিময়ে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহার দ্বারাই মাপা হয় না—আরও অন্যান্য সম্পর্কের উপর ইহা নির্ভর করে। মজুর তাহার শ্রমশক্তির বিনিময়ে মূলধনীর নিকট হইতে কিছু অর্থ পায়।

এখন প্রশ্ন এই যে, মজুরী কি কেবল এই আর্থিক-মূল্য দ্বারাই নিরূপিত হয় ?

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আমেরিকায় বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য-খনির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সরবরাহ বাড়িয়া যায়, কাজে কাজেই অন্যান্য পণ্যের তুলনায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য পড়িয়া যায় ; কিন্তু মজুর পূর্ব্বের ন্যায় মজুরী বাবদ অর্থ পাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় যদিও মজুরের মজুরী বাবদ অর্থ ঠিকই থাকে, আসলে কিন্তু তাহার মজুরী পড়িয়া যায় কারণ একই রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে সে অপেক্ষাকৃত অল্প পণ্য পায়। এই জন্য খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আমরা মূলধনের বৃদ্ধি ও বুর্জ্জোয়াজীর উত্থান দেখিতে পাই।

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্ ;—১৮৪৭ সালের শীতকালে অজন্মা হওয়ায় জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা, শস্য, মাখন, পনীর, রুটি প্রভৃতির বাজার-মূল্য বেশ বাড়িয়া যায়। কিন্তু এ অবস্থাতেও যদি মজুর পূর্ব্বের ন্যায় মজুরী পাইয়া থাকে ত, আসলে কি তাহার মজুরী কমিল না ? নিশ্চয়ই ; কারণ একই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে সে ঐ সময়ে অনেক কম খাদ্য সামগ্রী পাইত। তাহার মজুরী কমিল কারণ রৌপ্যের মূল্য কমিল বলিয়া নয়, পক্ষান্তরে জিনিষপত্রের মূল্য বাড়িল বলিয়াই।

আবার মনে করুন, মজুরী বাবদ অর্থের পরিমাণ ঠিকই

রহিল ও সেই সঙ্গে নানা কারণে কৃষিজ ও শিল্পজ দ্রব্যাদির বাজার-মূল্য অনেক কম হইয়া গেল, এমতাবস্থায় কী হইবে? মজুর একই অর্থে অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রব্যাদি কিনিতে পারিবে অর্থাৎ যদিও তাহার মজুরী বাবদ অর্থ বাড়ে নাই, তাহা হইলেও আসলে তাহার মজুরী বাড়িয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, মজুরের নামমাত্র (nominal) মজুরী অর্থাৎ মজুরী বাবদ অর্থ সব সময়ে তাহার আসল মজুরী অর্থাৎ বিনিময়ে যে দ্রব্যাদি পাওয়া যায় তাহার সহিত সমান নহে। সুতরাং মজুরীর হ্রাসবৃদ্ধি বলিতে আমরা কেবলমাত্র নামমাত্র মজুরীর হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝি না।

কেবলমাত্র নামমাত্র মজুরী ( অর্থাৎ যে পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মজুর পুঁজিপতির নিকট নিজেকে বিক্রয় করে ) বা আসল মজুরী ( অর্থাৎ ঐ অর্থ দ্বারা সে যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করে )—এই দুই অর্থেই 'মজুরী' এই কথাটীর ব্যাপকতা শেষ হইল না।

কেন না সর্ব্বোপরি পুঁজিপতির লাভের অনুপাতে মজুরী নির্দ্ধারিত হয়, বা মজুরী পুঁজিপতির লাভের আপেক্ষিক।

আসল মজুরী (Real wage) অন্যান্য পণ্যের বাজার মূল্যের তুলনায় শ্রমশক্তির বাজার-মূল্য প্রকাশ করে অপর পক্ষে আপেক্ষিক মজুরী (Relative wage) নবোৎপাদিত

মূল্যে বঞ্চিত শ্রম বা মূলধনের ভাগের তুলনায় শ্রমের ভাগ প্রকাশ করে।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, শ্রমিক যে পণ্য উৎপন্ন করে তাহার অংশস্বরূপ মজুরী নহে, পক্ষান্তরে মজুরী হইতেছে বর্ত্তমান পণ্যের সেই অংশ যাহার দ্বারা পুঁজিপতি উৎপন্নশীল শ্রমশক্তি খরিদ করে। শ্রমিকের দ্বারা উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাওয়া গেল, তাহার দ্বারা পুঁজিপতিকে পূর্ব্বপ্রদত্ত মজুরীর ক্ষতি পূরণ করিতে হইবে ; তাহার সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকে যে এই ক্ষতিপূরণ উৎপাদন-খরচ অপেক্ষা বেশী হউক অর্থাৎ তাহার লাভ হউক। শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্যের বিক্রয় লব্ধ অর্থ পুঁজিপতির নিকট তিন বিভিন্ন রূপে আত্ম-প্রকাশ করে—

১। কাঁচামাল বাবদ সে যে টাকা অগ্রিম দিয়াছে তাহার ও যন্ত্রপাতির ঝড়তি পড়তির ক্ষতিপূরণ।

২। মজুরী বাবদ অগ্রিম প্রদত্ত অর্থের ক্ষতিপূরণ।

৩। বাকী অংশই তাহার লাভ। ইহার মধ্যে প্রথম ভাগটীই কেবল মাত্র পূর্ব্বের মূল্যের (values formerly present) ক্ষতিপূরণ করে, অপর দুই ভাগই অর্থাৎ মজুরীর অর্থ ও পুঁজিপতির লাভ, শ্রমিকের শ্রম দ্বারা কাঁচা মালে যে নব-মূল্য সংযোজিত করা হইল, তাহা হইতেই প্রদত্ত হইল। এই অর্থে আমরা মজুরী ও লাভকে (শ্রমিকের

উৎপাদনে অংশ হিসাবে) পরস্পরের মধ্যে তুলনা করিতে পারি।

আপেক্ষিক মজুরী কমিয়া গেলেও, আসল মজুরী স্থির থাকিতে পারে বা এমন কি বাড়িতেও পারে। যেমন জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার-মূল্য এক-তৃতীয়াংশে দাঁড়াইল কিন্তু দিন মজুরী দুই-তৃতীয়াংশ হইল অর্থাৎ দৈনিক তিন টাকার স্থলে দুই টাকা হইল। এ অবস্থায় যদিও শ্রমিক পূর্ব্বে তিন টাকার যে পরিমাণ জিনিষ পাইত, এখন দুই টাকায় তাহার অধিক পণ্য খরিদ করিতে পারে, তাহা হইলেও পুঁজিপতির লাভের অনুপাতে তাহার মজুরী কমিয়া গেল। পুঁজিপতির লাভ এক টাকা পরিমাণ বাড়িয়া গেল অর্থাৎ পুঁজিপতির অপেক্ষাকৃত অল্প পণ্যের বিনিময়ে শ্রমিককে অপেক্ষাকৃত বেশী পণ্য উৎপন্ন করিতে হইল। শ্রমের অংশ অপেক্ষা মূলধনের অংশ বাড়িয়া গেল; শ্রম ও মূলধনের মধ্যে সামাজিক সম্পত্তির বিভাগ আরও অসমান হইয়া উঠিল। একই পরিমাণ মূলধনের সাহায্যে পুঁজিপতি অধিক পরিমাণ শ্রম ক্রয় করিল। শ্রমিকশ্রেণীর উপর পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রভুত্ব অধিকতর কায়েম হইল, শ্রমিকের সামাজিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ হইল ও সে পুঁজিপতি অপেক্ষা আরও এক ধাপ নিম্নে নামিয়া গেল।

৬

এখন প্রশ্ন এই যে, কোন্ সার্ব্বজনীন নিয়ম দ্বারা মজুরী ও লাভের পারস্পরিক উঠা নামা নির্দ্ধারিত হয়?

তাহারা পরস্পরের সহিত বিপরীত সম্পর্কে সম্বদ্ধ। শ্রমের অংশ অর্থাৎ মজুরী যে হারে কমে, সেই হারেই মূলধনের অংশ বা লাভ বাড়িয়া থাকে আর মজুরী যে হারে বাড়ে, ঠিক সেই হারেই লাভ কমিয়া যায়।

আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সময়ে সময়ে পুঁজিপতি তাহার পণ্যের অত্যধিক চাহিদা হেতু (নূতন বাজার অধিকার করিয়াই হউক বা পুরাতন বাজারের চাহিদা বাড়াইয়াই হউক) অন্যান্য পুঁজিপতির পণ্যের বিনিময়ে অধিক লাভ করিতে পারে—এ অবস্থায় মজুরীর কোন রকম পরিবর্ত্তন না ঘটাইয়াও কেবলমাত্র অন্যান্য পুঁজিপতির সহিত প্রতিযোগিতায় সে বেশী লাভ করিল। অথবা উৎপাদনের যন্ত্রপাতির উন্নতি করিয়া বা স্বাভাবিক শক্তিকে নব নব উপায়ে কার্য্যে লাগাইয়া সে স্বীয় লভ্যাংশ বাড়াইতে পারে।

যাহাই হউক না কেন, আমাদের সার্ব্বজনীন নিয়ম ঠিকই রহিল—একটু মনোনিবেশ করিলেই আমরা তাহা দেখিতে পাইব। এই ক্ষেত্রে মজুরীর কমা'র জন্য লাভের অংশ বাড়িল না বটে কিন্তু লাভের বৃদ্ধি হেতু মজুরীর অংশ

কমিল। একই পরিমাণ শ্রমশক্তির সাহচর্য্যে পুঁজিপতি অধিক পরিমাণ বিনিময়-মূল্য পাইল কিন্তু ইহার জন্য শ্রমিককে এক পয়সাও বেশী দিল না অর্থাৎ পুঁজিপতির মোট লাভের মধ্যে শ্রমের অংশ কম হইল।

উপরন্তু আমাদের ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, পণ্যের বাজার-মূল্যের উঠা-নামা সত্ত্বেও, তাহার গড়পড়তা বাজার-মূল্য ( যে হারে তাহার অন্য পণ্যের সহিত বিনিময় হয় ) উৎপাদন খরচ দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। কাজে কাজেই পুঁজিপতিগণের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হেতু যে অসাম্য দেখা যাইত, তাহা অন্তর্হিত হয়। যন্ত্রপাতির উন্নতি, ও স্বাভাবিক শক্তিসমূহের নব নব কার্য্যক্ষমতা দ্বারা আমরা উৎপাদন ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে একই পরিমাণ মূলধন ও শ্রমশক্তির সাহায্যে অধিক পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু কোন মতেই অধিক পরিমাণ বিনিময়-মূল্য উৎপন্ন করিতে পারা যায় না। মনে করা যাক্, বুনানীর যন্ত্র উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের দুইগুণ পরিমাণ বুনিতে পারা যায় অর্থাৎ পূর্ব্বে পঞ্চাশ গজ বুনিতে পারিলে এখন সেই সময় একশত গজ বুনা যায় কিন্তু পূর্ব্বে পঞ্চাশ গজের বিনিময়ে যে পণ্য পাওয়া যাইত এখন এক শত গজে তাহা অপেক্ষা একটুও বেশী পাওয়া যায় না কারণ উৎপাদন খরচা ঠিক অর্দ্ধেক লাগিয়াছে বা একই খরচায় দ্বিগুণ পণ্য উৎপন্ন হইয়াছে।

পরিশেষে, এক দেশের বা সারা জগতের পুঁজিপতিশ্রেণী নিজেদের মধ্যে যে হারেই লভ্যাংশ বিভাগ করুক না কেন, এই মোট লভ্যাংশ সর্ব্বদাই সঞ্চিত শ্রম বর্ত্তমান শ্রম দ্বারা যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় তাহার উপরই নির্ভর করে। কাজেই যে হারে শ্রম সঞ্চিত শ্রমকে বৃদ্ধি করে, সেই অনুপাতেই মোট লভ্যাংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আর্থাৎ সেই হারে মোট লাভ মজুরীর অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

তাহা হইলে মূলধন ও মজুরীর সম্পর্কেও আমরা দেখিতেছি যে মূলধন ও মজুরীর স্বার্থ পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন।

মূলধনের দ্রুত বৃদ্ধি ও লাভের দ্রুতবৃদ্ধি একই কথা। আপেক্ষিক মজুরীর বাজার-মূল্য দ্রুতগতিতে কমিলেই লভ্যাংশ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। নাম-মাত্র মজুরী বা আসল মজুরী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সমকালেই আপেক্ষিক মজুরী কমিতে পারে—ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

আবার মূলধনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি শ্রমিকের মজুরী বাড়ে, তাহা হইলে পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অনৈক্য বাড়িতেই থাকে এবং শ্রমিকের দাসত্ব ও মূলধনের প্রভুত্ব বাড়িয়া যায়।

মূলধনের দ্রুত বৃদ্ধিতে শ্রমিকের স্বার্থ আছে বলার মানে এই যে, যত দ্রুত শ্রমিক তাহার প্রভুর পণ্যসম্পত্তি বাড়াইয়া

দেয়, ততই কৃপাকণা তাহার উপর বর্ষিত হয়, ততই অধিক-সংখ্যক শ্রমিক কাজ পায় এবং ততই শ্রমিকশ্রেণী মূলধনীদের দাসে পরিণত হয়।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে, খুব অনুকূল অবস্থা-তেও ( অর্থাৎ যখন মূলধন দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হয় ) শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থার সামান্য উন্নতি ঘটে সত্য, কিন্তু পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত স্বার্থ সংঘাত তাহার মোটেই কমে না। পূর্ব্বের ন্যায়, মজুরী ও লাভ পরস্পর বিপরীত স্বার্থ সম্পন্নই থাকে।

মূলধনের দ্রুত বৃদ্ধির সময়ে মজুরীও বাড়িতে পারে বটে, কিন্তু লাভ মজুরী অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যায়। শ্রমিকের অর্থনৈতিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় কারণ পুঁজিপতি শ্রেণীর সহিত তাহার যে অনৈক্য তাহা প্রভূত বর্দ্ধিত হয়।

পরিশেষে উৎপন্নশীল মূলধনের সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধিই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে একমাত্র অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে— ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যত দ্রুত শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের বিরুদ্ধ-স্বার্থ-সম্পন্ন ও অত্যাচারী পুঁজিপতি শ্রেণীর অর্থ সম্পত্তি বাড়াইয়া দেয় তত তাহার অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয় ও যে দাসত্ব শৃঙ্খলে সে আবদ্ধ আছে, তাহা স্বর্ণ-শৃঙ্খল ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকে।

এখন প্রশ্ন এই যে বুর্জ্জোয়া অর্থনীতিকগণের মতানুযায়ী উৎপন্নশীল মূলধনের বৃদ্ধি ও মজুরীর বৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত,

তাহা সত্য কি না? না, তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিলে চলিবে না। তাঁহারা বলেন, মূলধন যত বৃদ্ধি পায়, মজুরীও তত বর্দ্ধিত হয়—ইহা সত্য নহে। বুর্জ্জোয়াজীর হিসাব পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া ইহা নিঃসন্দেহে ঘোষণা করা যাইতে পারে যে সামন্তযুগীয় প্রভুদের কুসংস্কার তাহাদের নাই। (সামন্তযুগীয় প্রভুরা স্বীয় অনুগত ও অমাত্য-মণ্ডলীকে মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া গৌরব অনুভব করিতেন।) তাঁহারা বেশ হিসাব করিয়াই চলিতে জানেন, নচেৎ তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকাই দুর্ঘট।

৭

তাহা হইলে আমরা এখন পরীক্ষা করিব যে, উৎপন্নশীল মূলধনের বৃদ্ধি মজুরীর উপর কি ভাবে ও কতখানি প্রভাব বিস্তার করে।

বুর্জ্জোয়া সমাজে উৎপন্নশীল মূলধন সাধারণ ভাবে বৃদ্ধি হইলে, আমরা শ্রমিক সংগ্রহে বহুবিধ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। পুঁজিপতি সংখ্যায় ও সমৃদ্ধিতে বৃদ্ধি লাভ করে। সংখ্যায় বাড়িলে পুঁজিপতিগণের মধ্যে অধিক প্রতিযোগিতা দেখা যায়। আর মূলধনের ক্রমবৃদ্ধির ফলে শিল্প-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্ত্রপাতি সমেত অধিক সংখ্যক শক্তিশালী শ্রমিক নিযুক্ত হয়।

পুঁজিপতি কেবল অপেক্ষাকৃত সস্তায় পণ্য বিক্রয় করিয়াই অপর পুঁজিপতিকে হঠাইয়া বাজার দখল করিতে পারে। ব্যবসায়ের ক্ষতি না করিয়া সস্তায় পণ্য বিক্রয় করিতে হইলে পুঁজিপতিকে উৎপাদনের খরচ কমান ছাড়া উপায় নাই অর্থাৎ তাহাকে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার দিকে নজর দিতে হয়। আবার শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইলে সর্ব্বোপরি উন্নত যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয় ও শ্রমবিভাগ বাড়াইতে হয়। যন্ত্রপাতির যত উন্নতি হয়, শ্রমকার্য্যের যত বেশী ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, ততই উৎপাদন

খরচা কম হয় ও ততই অধিক পণ্য উৎপন্ন হয়। কাজেই পুঁজিপতিগণের মধ্যে উন্নত যন্ত্রপাতির আমদানী, শ্রমকার্য্যের অতি সূক্ষ্ম বিভাগ ও অধিক পরিমাণে শ্রমিকশ্রেণীকে ঠকাইবার প্রচেষ্টা দেখা যায় এবং তাহারা পরস্পরের সহিত এই বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে।

মনে করুন, একজন পুঁজিপতি উন্নত যন্ত্রপাতির আমদানি করিয়া, শ্রমিকগণের মধ্যে কার্য্যের অতি সূক্ষ্ম বিভাগ করিয়া, স্বাভাবিক শক্তি সমূহকে অধিক পরিমাণে কাজে লাগাইয়া, একই পরিমাণ শ্রমশক্তির দ্বারা অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন করিল (অন্যান্য পুঁজিপতি যখন এক গজ পশম বুনে, সে তখন দুই গজ বুনে) তাহা হইলে সে এখন কি উপায়ে অগ্রসর হইবে?

সে এখন পূর্ব্বের বাজার দরেই তাহার পণ্য বিক্রয় করিতে পারে কিন্তু তাহাতে অন্যান্য প্রতিযোগীকে হটাইয়া বাজার দখল করা যায় না। তাহার উৎপাদন শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিক্রয়ের মাত্রাও বাড়াইতে হইবে। অধিকতর শক্তিশালী ও মূল্যবান উৎপাদন উপায়ের সাহায্যে সে অপেক্ষাকৃত সস্তায় বিক্রয় করিতে সমর্থ বটে কিন্তু এগুলি আবার তাহাকে অধিক পরিমাণে বিক্রয় করিতেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বাজার দখল করিতে বাধ্য করে। কাজেই অনন্যোপায় হইয়া আমাদের পুঁজিপতি অন্যান্য পুঁজিপতি অপেক্ষা সস্তায় পণ্য বিক্রয় করে।

যদিও এক্ষেত্রে আমাদের পুঁজিপতি অর্দ্ধগজ বুনানীর খরচে এক গজ বুনিয়াছে, তাহা হইলেও সে অর্দ্ধগজের বাজার-মূল্যে এক গজ বিক্রয় করিবে না, কারণ তাহা হইলে সে কিছুই লাভ করিবে না—কেবল উৎপাদন খরচ ফেরৎ পাইবে মাত্র। সে যত পরিমাণ অধিক মূলধন ব্যবসায় নিযুক্ত করিবে, ততই তাহার লাভ বেশী হইবে। অন্যান্য প্রতিযোগীদের পণ্যের বাজার-মূল্য অপেক্ষা তাহার পণ্যের বাজার-মূল্য সামান্য কম করিলেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ সে তাহাদের হটাইয়া একাই বাজার দখল করিতে পারিবে। আবার আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, কোন পণ্যের বাজার-মূল্য সকল সময়েই ব্যবসার অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থার জন্য উৎপাদন-খরচার বেশী বা কম থাকে। কাজেই যে অনুপাতে পণ্যের বাজার-মূল্য পুরাতন উৎপাদন খরচার বেশী বা কম থাকে, সেই অনুপাতেই আমাদের এই পুঁজি-পতির লাভের পরিমাণও অপেক্ষাকৃত বেশী বা কম হয়।

কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রে আমাদের পুঁজিপতি একা অধিক দিন এই সুযোগ ভোগ করিতে পারে না কারণ অন্যান্য পুঁজিপতিগণ অল্প কালের মধ্যেই আমাদের পুঁজিপতির ন্যায় নূতন যন্ত্রপাতি নিযুক্ত করে ও সমহারে শ্রমকার্য্যে সূক্ষ্ম বিভাগ প্রবর্ত্তন করে, ফলে শীঘ্রই এক গজ বুনানীর বাজার-মূল্য পূর্ব্বেকার উৎপাদন খরচের কম ত হয়ই এমন কি তাহার নূতন উৎপাদন খরচেরও কম হয়।

নূতন যন্ত্রপাতি আমদানীর পূর্ব্বে তাহারা যে অবস্থায় ছিল, পুঁজিগতিগণ শাঘ্রই সেই অবস্থায় উপনীত হয় এবং পূর্ব্বের উৎপাদন খরচে যদি তাহারা দ্বিগুণ পণ্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বের বাজার-মূল্যে বা তাহার কমে তাহারা দ্বিগুণ পণ্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। নূতন যন্ত্রপাতির কার্য্যে নিয়োগ ও শ্রমকার্য্যে সূক্ষ্ম বিভাগ প্রবর্ত্তন সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় ও পূর্ব্বের ন্যায়ই পুঁজিপতিগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যায়।

তাহা হইলে, কি উপায়ে উৎপাদনের নব নব যন্ত্রপাতি ও নব নব উপায়ের ক্রমাগত উদ্ভাবনে শিল্পজগতে যুগান্তর সংঘটিত হয় তাহা আমরা দেখিলাম। আমরা ইহাও দেখিলাম যে, শ্রমকার্য্যে সূক্ষ্ম বিভাগ আরও সূক্ষ্ম বিভাগ আনয়ন করে, যন্ত্রপাতির নিয়োগ অপেক্ষাকৃত উন্নত যন্ত্রপাতির চাহিদা বাড়ায় ও বৃহৎ ব্যবসা বৃহত্তর ব্যবসায় পরিণত হয়। এই নিয়ম অনুসারেই ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন কার্য্য পূর্ব্বের গণ্ডী ছাড়াইতে বাধ্য হয় এবং এই কারণেই মূলধন ক্রমাগত শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে ক্ষমতাপন্ন করিয়া তুলে। মূলধনের এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করিবার সময় নাই—এই নিয়ম অনবরত মূলধনের কাণে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—‘এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।” ইহারই জন্য কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাণিজ্যের উঠা-নামা

পণ্য করিয়া, পণ্যের বাজার-মূল্য উৎপাদন খরচের সমান হয়।

একজন পুঁজিপতি যেরূপ শক্তিশালী যন্ত্রপাতিই উৎপাদন-ব্যাপারে নিযুক্ত করুক না কেন, অতি শীঘ্রই অন্যান্য প্রতিযোগিগণ সেইপ্রকার যন্ত্রপাতি আমদানী করে, ফলে উৎপাদনবহুলতার জন্য একই বাজার মূল্যে পূর্ব্বের অপেক্ষা দশগুণ, বিশগুণ বা শতগুণ পণ্য বিক্রীত হয়। কিন্তু যেহেতু এখন বহুমূল্য যন্ত্রপাতি নিযুক্ত করা হইয়াছে, সেই জন্য লাভের জন্য না হউক কেবলমাত্র উৎপাদন খরচ উঠাইবার জন্যই পুঁজিপতিকে পূর্ব্বের হাজার গুণ বিক্রয় করিতে হইবে এবং এই অধিক বিক্রয়ের উপরই তাহার ও অন্যান্য পুঁজিপতিগণের স্থিতি নির্ভর করে—কাজে কাজেই নূতন যন্ত্রপাতির অত্যধিক উৎপাদন ক্ষমতার জন্য আবার সেই পূর্ব্বেকার সংগ্রাম ভীষণভাবে দেখা যায়—শ্রমকার্য্যে সূক্ষ্ম বিভাগ ও নূতন নূতন যন্ত্রপাতির নিয়োগ সেই সংগ্রামকে সাহায্য করে।

উৎপাদনে নিযুক্ত নূতন নূতন যন্ত্রপাতি যতই ক্ষমতাশালী হউক না কেন, প্রতিযোগিতাই ইহার স্বর্ণপ্রসূ ফলকে অপহরণ করে অর্থাৎ পণ্যের বাজার-মূল্যকে উৎপাদন খরচে নামাইয়া আনে—যে পরিমাণে অল্প শ্রমশক্তির সাহায্যে অধিক পণ্য উৎপাদন সম্ভব হয়, সেই অনুপাতেই অল্প

বাজার-মূল্যে অধিক পরিমাণ পণ্য বিক্রীত হয়। কাজেই পুঁজিপতি তাহার এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য কিছুই লাভ করিল না, কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট শ্রমসময়ে অধিক উৎপন্ন করিতে বাধ্য রাহল বা মূলধনের লাভজনক নিয়োগের পক্ষে অধিকতর অসুবিধাকর অবস্থার সৃষ্টি করিল। কারণ প্রতিযোগিতা অনবরতই উৎপন্ন পণ্যের বাজার-মূল্য উৎপাদন খরচে নামাইয়া আনিতে ব্যস্ত এবং পুঁজিপতি বিপক্ষগণের বিরুদ্ধে যে যে অস্ত্র শাণিত করে, তাহার প্রত্যেকটীই নিজের বিরুদ্ধে যায় এবং পুঁজিপতিও কালক্ষেপ না করিয়া স্বীয় নৈরাশ্যজনক অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় ক্রমাগতঃ নূতন নূতন যন্ত্রপাতি আমদানী করে ও শ্রমকার্য্যে সূক্ষ্মতর বিভাগ প্রবর্ত্তন করে ও এইরূপে স্বীয় শোচনীয় অবস্থাকে অধিকতর শোচনীয় করিয়া তুলে।

সারা পৃথিবীর বাজারে অবিরত যে ভীষণ সংঘর্ষ চলিতেছে তাহার কথা চিন্তা করিলে আমরা সহজে বুঝিতে পারিব যে কিরূপে মূলধনের বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও নিয়োগের সমকালেই শ্রমকার্য্যের সূক্ষ্মতর বিভাগ ও অপেক্ষাকৃত নূতন ও উন্নত যন্ত্রপাতির চাহিদা অতি দ্রুতভাবে ও উচ্চ হারে বাড়িয়া যায়।

কিন্তু উৎপন্নশীল মূলধনের বৃদ্ধির সহিত অভিন্নভাবে যুক্ত উপরিলিখিত অবস্থাগুলির মজুরী নির্দ্ধারণে কোন সম্পর্ক আছে কি না?

শ্রমকার্য্যে সূক্ষ্মবিভাগ হেতু একজন শ্রমিক পাঁচ, দশ বা বিশজন শ্রমিকের কার্য্য করিতে পারে অর্থাৎ শ্রমিকগণের মধ্যে পাঁচ, দশ বা বিশগুণ প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকগণ কেবল অপর শ্রমিক অপেক্ষা কম মজুরীতে রাজী হইলেই তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যায় না—পরন্তু যখন একজন শ্রমিক বহু শ্রমিকের কার্য্য করে, তখনও প্রবল প্রতিযোগিতা দেখা যায়। মূলধনের দ্বারা নিযুক্ত শ্রমকার্য্যে সূক্ষ্ম বিভাগ সমূহ শ্রমিকগণকে ঐ ভাবে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে বাধ্য করে।

আবার, যে হারে শ্রমকার্য্যে সূক্ষ্ম বিভাগ প্রবর্ত্তিত হয় সেই হারেই শ্রম কার্য্য তত সহজ হইয়া দাঁড়ায়। শ্রমিকের বিশেষ দক্ষতা আর কাজে লাগে না; তাহার পরিবর্ত্তে সহজ ও একঘেয়ে উপায়ে পণ্য উৎপন্ন হয় ও এই উৎপাদন ব্যাপারে শারীরিক শক্তির বা মানসিক কৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, শ্রমিক হিসাবে উপযুক্ত হইতে যাহার যত অল্প শিক্ষা ও অল্প খরচের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহার মজুরী তত কম, কারণ মজুরীর বাজার-মূল্যও অন্যান্য পণ্যের বাজার-মূল্যের ন্যায় উৎপাদন খরচার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সেইরূপ শ্রমকার্য্যে দক্ষতা যতই অপ্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ শ্রমকার্য্য যতই অপ্রীতিকর ও বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায় ততই প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়

ও মজুরী কম হয়। শ্রমিকও আবার তাহার মোট আয়ের পরিমাণ পূর্ব্ববৎ রাখার জন্য প্রায়ই অধিক ঘণ্টা কাজ করে বা বেশী পণ্য উৎপন্ন করে—অভাবের তাড়নায় শ্রমকার্য্যে সূক্ষ্মবিভাগ জনিত দোষগুলিকে সে আরও মূর্ত্ত করিয়া তুলে। ফলে, সে যত বেশী শ্রম করে, তত কম মজুরী পায়। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, বেশী শ্রম করিতে যাইয়া সে অন্যান্য শ্রমিক ভাইদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ও তাহাদিগকেও নিজের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে বাধ্য করে। এইরূপে শ্রমিকশ্রেণীর সভ্য হিসাবে সে নিজের বিরুদ্ধেও প্রতিযোগিতা করে, কাজেই তাহার ও অন্যান্য শ্রমিকভাই-দের একই রূপ শোচনীয় অবস্থায় পড়িতে হয়।

শ্রমকার্য্যে উন্নত যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তনও একই ফল দেয় অর্থাৎ দক্ষ শ্রমিককে সাধারণ শ্রমিক দ্বারা পরিবর্ত্তন করে, পুরুষ শ্রমিকের স্থানে মেয়ে শ্রমিক, যুবক শ্রমিকের স্থানে বালক শ্রমিক নিযুক্ত করে; যন্ত্রপাতির যত উন্নতি ঘটে ও শ্রম-শিল্প যত অগ্রসর হয় ততই শ্রমিক সংখ্যা কমানর দিকে পুঁজিপতি লক্ষ্য দেয়। আমরা পূর্ব্বে পুঁজিপতিগণের পর-স্পরের মধ্যে যে শিল্পযুদ্ধ বর্ত্তমান তাহার একটী সংক্ষিপ্ত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। এই শিল্পযুদ্ধের বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য যুদ্ধে যেমন সৈন্য সংখ্যা বাড়াইয়া জয় লাভের আশা করা যায়, ইহাতে তেমনি সৈন্য সংখ্যা বা শ্রমিক সংখ্যা

কমাইয়াই জয় লাভ করা যায়। সৈন্যাধ্যক্ষ বা পুঁজিপতি-গণ কে কত সংখ্যক সৈন্য বা শ্রমিক বরখাস্ত করিতে পারে সেই বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে।

বুর্জ্জোয়া অর্থনীতিকগণ বলেন যে, যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তনে যে সমস্ত শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হইল, তাহারা নূতন কাজ পায়। তাঁহারা সোজাসুজি বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন যে, তাহারা নূতন শিল্প বিভাগে প্রবেশ করে। আসল ব্যাপার কিন্তু মোটেই এরূপ নয়। কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকগণ নূতন শিল্পবিভাগে প্রবেশ করে না—শ্রমিক শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত তরুণ শ্রমিক-গণই নূতন শিল্প বিভাগে প্রবেশ করে (ইহারা হয়ত পূর্ব্বেকার শিল্পেই কার্য্যের সন্ধান করিত।) অবশ্য কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের ইহা সান্ত্বনার কথা। কারণ পুঁজিপতি মহাশয়-গণের ঠকাইবার জন্য আর নূতন নূতন রক্তমাংসময় শরীরের প্রয়োজন হয় না ; 'গতস্য শোচনা নাস্তি'—এই বলিয়া তাঁহারা নিজের সান্ত্বনা লাভ করেন। কিন্তু হায়! যন্ত্রপাতির সাহায্যে যদি সারা শ্রমিক শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে মূলধনের কী অবস্থা হইবে!

মনে করুন, যন্ত্রপাতির দ্বারা কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকগণ ও উদীয়মান শ্রমিককুল সকলেই কোন না কোন নূতন শিল্প বিভাগে কাজ পাইল—তাহা হইলে কি ভাবেন যে, ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় মজুরী পাইবে? অর্থনীতিশাস্ত্রের অতি সাধারণ নিয়মগুলি ইহার বিপরীত সাক্ষ্যই দেয়। আমরা

দেখিয়াছি যে, আধুনিক শিল্প জগতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্তরের ও জটীল বিভাগের পরিবর্ত্তে সহজ ও সরল বিভাগই প্রযুক্ত হয়—তাহা হইলে অসংখ্য শ্রমিক যাহারা যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তনে কর্ম্মচ্যুত হইল, কিরূপে তাহারা অপেক্ষাকৃত কম মজুরী স্বীকার না করিলে নূতন বিভাগে কাজ পাইতে পারে ?

নূতন যন্ত্রপাতির উৎপাদনে যে সমস্ত শ্রমিক কার্য্য পায়, তাহাদিগকে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবেই ধরিতে হইবে। অবশ্য অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতি শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত হইলে যন্ত্রপাতির চাহিদা বাড়িয়া যায়; কাজে কাজেই যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্য এক নূতন শিল্প বিভাগ খোলা হয় ও তাহাতে নিযুক্ত শ্রমিকগণের অপেক্ষাকৃত দক্ষতা প্রয়োজন। ১৮৪০ সালের পূর্ব্বে এই ব্যাপারে কতকাংশ সত্য থাকিলেও এখন ইহা একেবারেই অসত্য হইয়া পড়িয়াছে। কারণ এখন যন্ত্রপাতির উৎপাদনেও বহু বিভিন্ন ও উন্নত প্রকারের যন্ত্রপাতি নিযুক্ত হয় এবং তাহাতে যে অল্পসংখ্যক শ্রমিকের সাহায্য প্রয়োজন, তাহা অতি সাধারণ শ্রমিকের দ্বারাও সম্ভব।

এখন একজন কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকের স্থলে, তিনজন বালক শ্রমিক ও একজন মেয়ে শ্রমিক নিযুক্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহার দ্বারা বুর্জ্জোয়া অর্থনীতিকগণ কী বলিতে চান্ ? একজন শ্রমিকের মজুরীতেই কি চারিজনের মজুরী দেওয়া হয় না? একজনের পরিবর্ত্তে চারিজন শ্রমিক নিযুক্ত

করিয়া তাঁহারা শ্রমিক শ্রেণীর কোন সুবিধা করিলেন না।

তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে, মূলধন যত উৎপন্নশীল হয় তত শ্রমকার্য্যে সূক্ষ্ম বিভাগ প্রবর্ত্তিত হয় ও তত নূতন নূতন যন্ত্রপাতি নিযুক্ত হয়। আবার শ্রমকার্য্যে নূতন যন্ত্রপাতি ও সূক্ষ্ম বিভাগের যত প্রবর্ত্তন হয় ততই শ্রমিকগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িয়া যায় ও ততই তাহাদের মজুরী কম হয়।

আর তা ছাড়াও, সমাজের উচ্চস্তর হইতে শ্রমিক সংগ্রহ হইতে থাকে, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা শিল্পবাণিজ্যের এইরূপ দ্রুত বৃদ্ধি ও উন্নতির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও জীবন ধারণের জন্য সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় মজুরী খাটা ভিন্ন তাহাদের আর কোন গতি থাকে না। কাজেই বুভুক্ষু শ্রমিকগণের সংখ্যা বাড়িয়া যায় ও তাহাদের ক্ষুধা নিবারণের আশাও দুরাশা বলিয়া মনে হয়।

ক্রমবর্দ্ধমান হারে উৎপাদন চলিলে ছোট ছোট উৎপাদন কারীরা বাঁচিতে পারে না ইহা জানা কথা। যে হারে মূলধনের পরিমাণ ও বিস্তৃতি বাড়িতে থাকে, সেই হারেই মূলধনের সুদ অর্থাৎ লাভ কমিতে থাকে, কাজেই ছোট ছোট ব্যবসায়ীগণ আর অত অল্প লাভের উপর নির্ভর করিতে পারে না এবং শীঘ্রই সর্ব্বহারা মজুর শ্রেণীভুক্ত হয়। এ সকল বিষয়ের আর বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে যে পরিমাণে উপলিখিত প্রকারে পুঁজি-পতিগণ উচ্চহারে উৎপাদনের উপায় সকলকে ঠকাইতে বাধ্য হয়, সেই পরিমাণে শ্রমশিল্পে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এই এক একটী ভূমিকম্পে জগতের এক একটি অংশের সমস্ত ধন-সম্পত্তি এমন কি উৎপাদনের শক্তিগুলিকেও সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া তবেই পৃথিবী রক্ষা পায়। আবার শিল্পজগতে এই ভূমিকম্প বা সঙ্কট (Crisis) উত্তরোত্তর প্রবল আকার ধারণ করে ও শনৈঃ শনৈঃ সংঘটিত হয়। কারণ উৎপাদন বহুলতার ফলে বিস্তৃত বাজারে চাহিদা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, জগতের বাজারে আর স্থান সংকুলান হয় না ও প্রত্যহ নূতন নূতন বাজারও আবিষ্কৃত হয় না। কিন্তু মূলধন কেবল শ্রমিকের রক্তশোষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, অত্যাচারী শক্তিমান শাসকের ন্যায় সে শ্রমিক শ্রেণীর কবর খনন করে ও সঙ্কট-কালে এক সঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম যে, মূলধন যত দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, শ্রমিকের মধ্যে প্রতিযোগিতা তদপেক্ষা দ্রুত বার্দ্ধিত হয় অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর জীবন ধারণের ও কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার উপায়গুলি তদপেক্ষা দ্রুত কমিয়া যায়; তথাপি মূলধনের দ্রুতগতি ও পরিণতি সর্ব্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে।

সমাপ্ত

# মজুরী ও মূলধন



ফ্রায়েডরিস এঙ্গেলশ

। ১৮২০ ১৮৯৫ ।

# মার্কস্‌বাদ

বৈজ্ঞানিক সমাজ-তন্ত্রবাদের জন্মদাতা হিসাবে মার্কস্‌ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ মানুষের চিন্তা-ধারাকে বিপুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। যদিও অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর মার্কস্‌ দেহত্যাগ করিয়াছেন তথাপি বিভিন্ন দেশে তাঁহার বৈজ্ঞানিক মতবাদ রাষ্ট্রে ও সমাজে যে বিপুল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতেছে, তাহার ফলে পৃথিবীর প্রতি অংশেই তাঁহার নাম আজ সুপরিচিত। আমাদের দেশেও শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মার্কস্‌ ও তাঁহার মতবাদকে জানিবার ইচ্ছা জনসাধারণের মধ্যে ক্রমেই দেখা যাইতেছে।

মার্কস্‌বাদকে জানিতে হইলে মার্কসের নীতি অনুসরণ করাই শ্রেয়। কোন ব্যক্তি বা তাঁহার মতবাদকে জানিতে হইলে তাঁহার সমসাময়িক ইতিহাস—রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তাধারার যে আবহাওয়ার মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, সেই ইতিহাস ও চিন্তাধারার সহিত পরিচয়ের প্রয়োজন।

কার্ল মার্কস্‌ ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের কৈশোর তদানীন্তন ইউরোপের বিপ্লবী চিন্তাধারার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হয়। ইউরোপের রাষ্ট্র ও সমাজ তখন ক্রমশঃ মধ্যযুগীয় অবস্থা হইতে আধুনিক অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। ইংলণ্ডে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভল্যুশন ১৭৬০ অব্দে প্রথম আরম্ভ হয়। পুরাতন কুটীরশিল্পকে ধ্বংস করিয়া এবং যন্ত্রপাতির নিয়োগ দ্বারা জনসাধারণের জীবনধারায় যে মৌলিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করে, তাহার ফলে সমাজে ধীরে ধীরে আর একটী শ্রেণী দেখা দেয়—সর্ব্বহারা শ্রমিক শ্রেণী। পুরাতন উৎপাদন ব্যাপারের আমূল পরিবর্ত্তনের

সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থায় বিপুল বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লব তাহার সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী লইয়া ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের নির্য্যাতীত অধিবাসীদের মনে নূতন আশার সঞ্চার করে। এই দুইটী ঘটনার বিপুল আঘাতে এবং রাষ্ট্রদর্শন সম্বন্ধে নূতন নূতন চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হওয়ার ফলে ইউরোপের এই সময়কার ইতিহাস বিপ্লবী চিন্তাধারা এবং রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে স্থানে স্থানে মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থানে পূর্ণ। ১৮৩০ অব্দে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভল্যুশন পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং এই সময়েই বুরবন্দের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই জুলাই বিপ্লবের প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে ইহারই ফলে ১৮৩৬ সালে লণ্ডন শ্রমিক সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়। ফ্রান্সে জুলাই বিদ্রোহের ফলে একমাত্র বুর্জ্জোয়ারাই লাভবান হয় এবং বর্দ্ধমান শ্রমিক সঙ্ঘ-শক্তির বিনাশের প্রতি এই নব উত্থিত বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর সমস্ত শক্তি নিযুক্ত হয়। বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর এই বিশ্বাসঘাতকতায় মজুর শ্রেণী ১৮৩১ অব্দে অভ্যুত্থান করে এবং তাহা নষ্ট হইলে পুনরায় ১৮৩৪ খৃঃ অঃ মজুররা বিদ্রোহ করে। এই সময় পেটি বুর্জ্জোয়া শ্রেণীও এই অভ্যুত্থানে যোগ দেয়। এইভাবে ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ শ্রমিক স্বার্থে ইউরোপে শ্রমিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে থাকে।

ফরাসী বিপ্লবের বাণী জার্ম্মাণীতেও উপস্থিত হয়। নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের অবস্থা গত মহাযুদ্ধের পরের অবস্থার মতই শোচনীয় ছিল। জার্ম্মাণ ছাত্র ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের ভিতর তখন অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণীকে একত্র করিয়া সংযুক্ত-জার্ম্মাণী-আন্দোলন চলিতেছিল। রুশিয়ার জার জার্ম্মাণজাতির একীভূত হওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। জুলাই বিদ্রোহের পর পোলাণ্ডের বিপ্লবী সম্প্রদায় রুশিয়ার

অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ নিষ্ফল হইবার পর পোল বিপ্লবীরা জার্ম্মাণীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। জার্ম্মাণ ছাত্র ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় পোলাণ্ডের মুক্তির পক্ষে থাকায়, পোলিশ ও জার্ম্মাণ ছাত্র ও বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় জারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা পোষণ করিতে থাকে। রুশ-গোয়েন্দা সন্দেহে কট্‌সিবুকে কার্ল-সাণ্ড নামক একটী ছাত্রকে হত্যা করে। এই অছিলা পাইয়া জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রিয়া গভর্ণমেণ্ট ছাত্র সমিতিগুলিকে নষ্ট করিতে থাকে।

জার্ম্মাণীতে এই সময় ইহুদীদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল। বহুবিধ অভাব ও অসুবিধার মধ্যে তাহাদের বাস করিতে হইত। কার্লের পিতা হেনরিচ মার্কস্ এই সব কারণে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি লক, ডিডেরট, ভলটেয়ার প্রভৃতি গ্রন্থকারের ভক্ত ছিলেন ও পুত্রকেও তাহা পড়াইয়াছিলেন। হেনরিচ পুরাপুরি বস্তুতান্ত্রিক ছিলেন এবং সেই কারণেই মার্কস্‌ও বস্তুতান্ত্রিকভাবে গড়িয়া উঠেন। যদিও ধর্ম্মের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল না তাহা হইলেও কার্ল মার্কস্ ইহুদী সমস্যা লইয়া ভাবিতেন। ইহুদীদের স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁহাকে ধীরে ধীরে জার্ম্মাণীর তদানীন্তন রাজনৈতিক আন্দোলনে আনিয়া উপস্থিত করে।

আজ সারা জগতে মার্কস্‌বাদ এতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ এই যে মার্কস্‌বাদ অকাট্য যুক্তির দ্বারা সোজাসুজিভাবে সকলের নিকট আবেদন উপস্থিত করে ও শ্রমিকের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সহিত সহজেই বেশ মিশিয়া যায়; তাঁহার প্রত্যেকটী মত কেবল 'থিওরি' মাত্র নহে—পরন্তু ইতিহাসে বহুবার ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা মার্কস্‌বাদকে (১) 'বাড়তি-মূল্য' নীতি (২) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও (৩) শ্রেণী সঙ্ঘর্ষ—প্রধানতঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একে একে আলোচনা করিব।

মোটামুটি ভাবে মার্কস্ 'মূল্যতত্ত্ব' সম্বন্ধে পূর্ব্ব যুগের অর্থনীতিকগণের মতেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন ( অবশ্য তাঁহাদের মতের অপ্রয়োজনীয় ও দ্ব্যর্থবোধক অংশ পরিহার করিয়া ), তবে তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, তিনি পূর্ব্বেকার 'মূল্যতত্ত্বে'র নীতিকে সম্পূর্ণ অভিনব উপায়ে কার্য্যে লাগাইয়াছেন—তিনি ইহা হইতে 'বাড়তি মূল্য' নীতি আবিষ্কার করিয়াছেন।

পূর্ব্ব যুগের অর্থনীতিবিদ্গণের মতে পণ্যের মূল্য অন্তর্নিহিত শ্রমশক্তির উপর নির্ভর করে এবং শ্রমিকের মজুরী ক্রমাগত জীবনধারণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়ের ক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে চেষ্টা করে। প্রধানতঃ এই দুইটী মতকে আশ্রয় করিয়াই মার্কস্ তাঁহার 'বাড়তি মূল্য' নীতি গড়িয়া তুলিয়াছেন। ম্যালথাস, রিকার্ডো প্রমুখ অর্থনীতিবিদ্গণ বিশ্বাস করিতেন যে, যেহেতু মজুরী বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বাড়ে, কাজেই মজুর সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মজুরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলে মজুরী ক্রমাগত জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। মার্কস্ পূর্ব্ব যুগের অর্থনীতিকগণের এই দুই মতই গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু এই দুই নীতি হইতে তিনি যে উপসংহারে উপস্থিত হইয়াছেন তাহা রিকার্ডো প্রমুখ অর্থনীতিকগণের সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

শ্রমিক তাহার উৎপাদিত পণ্যের মূল্যের অপেক্ষা বহুগুণে কম মজুরী পায়। কিন্তু সে তাহার জীবনধারণের প্রয়োজনের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক পণ্য উৎপাদন করে। কোনরকমে প্রাণধারণের মত মজুরী তাহাকে দেওয়া হয় আর উৎপাদিত পণ্যের বাকী অংশ পুঁজিপতির নিকট যায়। এই পুঁজিপতিই অর্থ দিয়া শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে। প্রাণধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত যে অংশ শ্রমিক

সৃষ্টি করে, তাহা সুদ, খাজনা, লাভ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পুঁজিপতির কাছে যায়। এই অতিরিক্ত অংশকেই মার্কস্ 'বাড়তি-মূল্য' নাম দিয়াছেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগে পরিশ্রম করিয়া ও শ্রমকার্য্যে সূক্ষ্ম-বিভাগ প্রবর্ত্তন করিয়া শ্রমিকেরা এই 'বাড়তি-মূল্য' সৃষ্টি করে। একশত শ্রমিক প্রত্যেকে পৃথক পৃথক পরিশ্রম করিয়া যে পণ্য উৎপন্ন করে তাহা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক পণ্য এই একশত জনই একত্রে পরিশ্রম করিয়া উৎপন্ন করিতে পারে। মূল্যবান্ যন্ত্র-পাতি ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কলকারখানা ও বহুপরিমাণ কাঁচামাল ব্যতীত এই একযোগে পরিশ্রম সম্ভব নয়। উৎপাদনের এই সমস্ত উপায়গুলি সম্পত্তিবিহীন শ্রমিকগণ সংগ্রহ করিতে পারে না। কাজেই তাহাদের পুঁজিপতিদের দ্বারস্থ হইতে হয়। পুঁজিপতি যন্ত্র-পাতি, কলকারখানা, কাঁচামাল ইত্যাদি যোগায় সুতরাং সহজেই শ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্যের বাড়তি ভাগ তাহারা আত্মসাৎ করিবার সুবিধা পায়। এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে উৎপাদন উপায়-বিহীন একদল সর্ব্বহারা শ্রেণীর উপরই পুঁজিপতিদের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

১৮৪৮ সালে তাঁহার 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' ও ১৮৫৯ সালে 'অর্থনীতির সমালোচনা' প্রকাশিত হয়। 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো'তে মার্কস্ 'ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা'কে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সঙ্ঘর্ষসমূহে ব্যবহার করেন। তাঁহার জীবনের প্রথম হইতেই এই বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা যে তাঁহার মধ্যে কাজ করিতেছিল, তাহা আমরা এইখানেই দেখিতে পাই। বস্তুতঃ ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করিয়াই মার্কসের অন্যান্য মতগুলি দেখা দিয়াছে। এইখানেই বৈজ্ঞানিক মার্কস্‌বাদের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের

সমাজতন্ত্রবাদের প্রভেদ। 'সমালোচনা'র ভূমিকায় মার্কসের মনের অন্তস্তল সর্ব্বপ্রথম সাধারণের নিকট উন্মোচিত হয় ও কি ভাবে তিনি পূর্ব্ব যুগের অর্থনীতিকগণের মতকে খণ্ডন করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নিজের স্বতন্ত্র মত স্থাপন করিতে চাহেন তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "বহু গবেষণার পর আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, রাষ্ট্র সমূহের বিভিন্ন রূপ ও আইনগত সম্পর্ক কখনই আপনা হইতে বা 'মানসিক উন্নতির' দ্বারা বুঝা সম্ভব নয়—জীবনের বাস্তব অবস্থার উপরই ইহার ভিত্তি।............সামাজিক উৎপাদন ব্যাপারে মানুষ পরস্পরের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করে—এই সম্পর্কের সহিত কিন্তু ইচ্ছাশক্তির কোন যোগ নাই। উৎপাদন-প্রথার বাস্তব শক্তি সমূহের বৃদ্ধির বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর এই সম্পর্ক নির্ভর করে। উৎপাদনের এই অর্থনৈতিক কাঠামগুলিকে একত্র করিলেই আমরা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠাম পাই—আবার এই অর্থনৈতিক কাঠামকে ভিত্তি করিয়া রাজনৈতিক ও আইনগত কাঠাম তৈয়ারী হয়। তাহা হইলে বাস্তব জীবনে উৎপাদন প্রথাই সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সাধারণ রূপ ফুটাইয়া তুলে। মানুষের চৈতন্য তাহাদের সামাজিক জীবন নির্দ্দেশ করে না, অপরপক্ষে তাহাদের সামাজিক অস্তিত্বই মানুষের চৈতন্য নির্দ্দেশ করে।"

সামাজিক উৎপাদন প্রথার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের ধারা পরিবর্ত্তিত হয়। সর্ব্বকালেই মানুষের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হইয়াছে, জীবন ধারণের উপায়গুলির অধিকার। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানুষ যে ভাবে ইহার উপর অধিকার স্থাপন করিয়াছে, যে ভাবে তাহারা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে উৎপাদন ব্যাপারে লাগাইয়াছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়াছে সমগ্র উৎপাদন প্রণালীর নিয়ন্ত্রণ।

## মজুরী ও মূলধন

সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে, কি ভাবে সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হইবে, কিরূপে সম্পত্তির বিভাগ হইবে, এমন কি, কি ভাবে মানুষ চিন্তা করিবে—এ সকল ব্যাপারই ইহার উপর নির্ভর করে। সামাজিক উৎপাদন প্রথার নির্দ্দিষ্ট অবস্থাকে কেন্দ্র করিয়াই ইতিহাস তৈয়ারী হয়, আবার এই প্রথার বিস্তৃতি ও রূপের পরিবর্ত্তন সাধিত হইলেই ইতিহাসও পরিবর্ত্তিত হয়। উৎপাদন ক্ষমতার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শ্রমের ভিন্ন ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়, বিভিন্ন শ্রেণী-সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, সম্পত্তি-বিভাগ সম্বন্ধে ভিন্ন আইন কানুন তৈয়ারী হয়, রাষ্ট্র পরিচালনার ধারা পরিবর্ত্তিত হয়, এক কথায় জীবন যাত্রার ও চিন্তাধারার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তন কিন্তু সহজে বা শান্ত ভাবে সাধিত হয় না কেননা সামাজিক প্রতিষ্ঠান একবার স্থাপিত হইলে, তাহার পক্ষে সকল সময়েই এমন কতগুলি লোক পাওয়া যায়, যাহারা কিছুতেই ইহা নষ্ট হইতে দিতে রাজী নয় কারণ ইহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের স্বার্থনাশ ঘটে। সুতরাং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কিছুতেই 'উৎপাদন ক্ষমতা'র অগ্রগতির সহিত পা মিলাইয়া চলিতে পারে না, যদি না মাঝে মাঝে বিপ্লব আসিয়া তাহাদের অগ্রসর করিয়া দেয়। মার্কসের নিজের ভাষায়—"সামাজিক উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধির ফলে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয়, যখন উৎপাদনের বর্ত্তমান সম্পর্কের সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। উৎপাদন প্রথার পূর্ব্ব সম্পর্কগুলি বর্ত্তমান গতির পথে সহায়ক না হইয়া বাধা হইয়া দাঁড়ায় ও সামাজিক বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠে। উৎপাদন শক্তি স্বীয় গতির পথে সকল বাধা কাটাইয়া নূতন রূপে দেখা দেয় ও তাহার উপরই নূতন সমাজের অর্থনৈতিক কাঠাম গড়িয়া উঠে এবং এই বিপ্ল-

-বের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ, আইন কানুন, চিন্তারাজ্য—সব কিছুতেই বিপ্লব আরম্ভ হইয়া যায়।”

মার্কসের মতবাদের এই অংশেই আমরা দার্শনিক হেগেলের ডায়া-লেকটিক মতবাদের প্রভাব দেখিতে পাই। হেগেলের ন্যায় তিনি বিশ্বাস করিতেন যে বিরুদ্ধ-স্বার্থ-বিশিষ্ট শ্রেণীর বিরোধের মধ্য দিয়াই ইতিহাস অগ্রগমন করে। উৎপাদন প্রথার বিবর্ত্তনের একটি নির্দ্দিষ্ট স্তরে প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থা একটি থিসিস্—আবার এই থিসিসের ভিতরই ‘এন্টি-থিসিস্ গুপ্ত থাকে। বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধনবাদ রূপ থিসিস্ উৎপাদন শক্তির উন্নতি ও বৃদ্ধির পথে শ্রমিকের সঙ্ঘশক্তি রূপ এন্টি-থিসিস্ সৃষ্টি করিতেছে। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায়গুলিকে সর্ব্বোচ্চ ব্যবহারে লাগাইবার জন্য শ্রমিকগণকে ফ্যাক্টরী ও বস্তীতে বাস করান হইতেছে ও একই নিয়মের অধীনে আনা হইতেছে ফলে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে শ্রমিক আন্দোলন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আবার উৎপাদন ব্যবস্থার একটি বিশেষ স্তর হইতেছে ধনবাদ—ধনবাদের কার্য্যকাল শেষ হইলে ইহা আর উৎপাদন শক্তিকে কোন মতে সাহায্য করিতে পারিবে না—তাহার উন্নতির পক্ষে বাধাস্বরূপ হইয়া পড়িবে। ‘উৎপাদন প্রণালী’ ধনবাদ অপেক্ষা আরও সুসঙ্ঘবদ্ধ রূপ চাহিবে, শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র সেই অবস্থার সৃষ্টি করিতে সক্ষম। ধনবাদিগণ কিন্তু বিনা সঙ্ঘর্ষে স্থানত্যাগ করিবে না—কাজে কাজেই এই ধনবাদী থিসিস্ ও সর্ব্বহারা এন্টিথিসিসের সঙ্ঘর্ষে এক নূতন শ্রেণীবিহীন সমাজরূপ সিনথিসিস্ বাহির হইবে। ইহার পূর্ব্বে যেমন ধনবাদী শ্রেণী মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, সেই ভাবে সর্ব্বহারা শ্রেণীও ধনবাদীদের স্থান গ্রহণ করিবে। তফাৎ মাত্র এই যে, তখন শোষণ করিবার মত আর কোন শ্রেণী থাকিবে না—সর্ব্বহারা শ্রেণীর

জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসের মতে "প্রাগৈতিহাসিক যুগ শেষ হইয়া ইতিহাসের যুগ আরম্ভ হইবে।"

হেগেলের এই থিসিস্-এন্টিথিসিস্-সিনথিসিসের মতবাদ মার্কস্ গ্রহণ করেন ও তাহাকে ধারাবাহিক শ্রেণী সঙ্ঘর্ষের ইতিহাসে প্রকাশ করেন। ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরেই থিসিস্ ও এন্টি-থিসিস্ দুইটী পরস্পর বিরোধী অর্থনৈতিক-স্বার্থ-সম্পন্ন শ্রেণী ও ইহা হইতে এক নূতন শ্রেণী-সম্পর্ক-যুক্ত নূতন সমাজ ব্যবস্থা সিনথিসিস্ হইয়া বাহির হয়।

মার্কস্ তাঁহার উপরিলিখিত মতবাদকে পূর্ব্ব যুগের আদর্শবাদের বিরুদ্ধে বাস্তব মতবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এইখানে যেন কেহ ভুল না বুঝেন যে, মার্কসের বস্তুতান্ত্রিকতায় সকল প্রকার মানসিক কার্য্যকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু তাঁহার বস্তুতান্ত্রিকতা এই মর জগতেই তাহার বাস্তব ক্ষেত্র খুঁজিয়া লইয়াছে, বাস্তব জগৎকে ছাড়াইয়া যে জগৎ, যেমন চিন্তা-জগৎ তাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। মার্কসের মতে একজন ব্যক্তি যে রকম ইচ্ছা চিন্তা করিতে বা কার্য্য করিতে পারে কিন্তু সে কিছুতেই সমসাময়িক সমস্যা ও ভাবধারার গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারে না। প্রতিযুগে সমাজের যে বৃহৎ রূপান্তর সংসাধিত হয় তাহার কারণ অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মানুষ যে ইচ্ছা লইয়া কাজ করুক না কেন, মোটের উপর এই অবস্থার প্রভাব হইতে সে মুক্ত নহে; আমরা এইস্থানে যেন তাঁহার মতের সহিত বেন্থামের মতবাদকে এক করিয়া না ফেলি—শেষোক্ত মত এই যে, মানুষ কেবল স্বীয় সুবিধা ও স্ফূর্ত্তির জন্যই কাজ করে। কিন্তু মার্কস্ বলেন যে, যুগে যুগে অর্থনৈতিক কারণের উপর নির্ভর করিয়াই সামাজিক বিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। যে কোন কারণেই মানুষ পরিশ্রম করুক না কেন

সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ইহা সত্য যে, একমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই মানুষ পরিশ্রম করে অর্থাৎ অর্থনৈতিক কারণেই সে উৎপাদন ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে। উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধিই মানুষের সমস্তার স্থষ্টি করে এবং 'মানুষও সকল সময়ে যেরূপ সমস্যা সে সমাধান করিতে পারে' তাহাই গ্রহণ করে। উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধির পক্ষে ও এই ক্ষমতাকে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের সহিত মানাইয়া লইবার পক্ষে যে চিন্তাধারার প্রয়োজন হয় পৃথিবীব আবর্ত্তনে তাহাই একমাত্র কার্য্যকরী হয়।

বুর্জ্জোয়া অর্থনীতিকগণ মার্কসের 'শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের' নীতিকে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের ধারণা যে মার্কস্ মাত্র সমসাময়িক কতকগুলি ঘটনার বিশ্লেষণ কয়িয়াই তাঁহার এই মত খাড়া করিয়াছেন। কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া এই বিংশ শতাব্দীর উন্নত সভ্যতার যুগেও আমরা দেখিতে পাই যে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে ও রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অনবরত বিরুদ্ধ-স্বার্থ-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামের ফলে কত সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র নষ্ট হইতেছে, আবার নূতন সমাজ, নূতন জাতি ও নূতন রাষ্ট্র স্থষ্টি হইতেছে। এই ক্রমাগত ভাঙ্গা গড়ার মধ্যেই প্রত্যেক দেশের ও জগতের ইতিহাস গঠিত হইতেছে। মার্কস্ এই শ্রেণীতে শ্রেণীতে সঙ্ঘর্ষ, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত, সমাজের এই আকস্মিক উত্থান ও পতনের ধারা বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক ভাবে তাঁহার 'শ্রেণী সঙ্ঘর্ষের' মতবাদে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত "কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো"তে বলেন—"পুরাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানব সমাজের ইতিহাস কেবলমাত্র শ্রেণী সঙ্ঘর্ষের ইতিহাস। স্বাধীন নাগরিক ও ক্রীতদাস, প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান, ব্যারন ও সার্ফ অর্থাৎ এক কথায় অত্যাচারী

ও অত্যাচারিত, শোষক ও শোষিত শ্রেণী চিরকাল পরস্পরের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে। কখনও কখনও তাহাদের এই সংগ্রাম গোপনে গোপনে চলে, কখনও বা প্রকাশ্যরূপ ধারণ করে—কখনও বা বিপ্লব দ্বারা সমাজের কাঠামকে পরিবর্ত্তিত করিয়া এই বিরোধের অবসান ঘটায় আর কখনও বা দুইটী বিরুদ্ধ শক্তিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।···বর্ত্তমানের বুর্জ্জোয়া সমাজ, মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে—কিন্তু ইহাতে শ্রেণীবিরোধের শেষ হয় নাই—মাত্র পুরাতন দুইটী বিরুদ্ধ শ্রেণীর পরিবর্ত্তে নূতন দুইটী শ্রেণী তৈয়ারী হইয়াছে·—নূতন প্রথায় শোষণ চলিতেছে ও নূতন রূপে সংগ্রাম দেখা দিয়াছে। তবে সুখের কথা এই যে, আমাদের বর্ত্তমান সমাজ মাত্র দুইটী বৃহৎ বিরুদ্ধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে—বুর্জ্জোয়াজী ও প্রোলেটারিয়েট।···ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে যে, বহুযুগের পরিণতির ফলেই, উৎপাদনে ও যানবাহনের উপায়ে বহু বিপ্লব ঘটিবার পরই এই বুর্জ্জোয়া সমাজের উৎপত্তি হইয়াছে।······একে একে সকল মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে—পড়িয়া আছে কেবলমাত্র সর্ব্বহারা মজুর শ্রেণী। ইহারাই একমাত্র সত্যকার বিপ্লবী শ্রেণী ও বুর্জ্জোয়াজীর ঘোরতর শত্রু। ইহাদের না হইলে বুর্জ্জোয়া সমাজের উৎপাদন প্রথা চলিতে পারে না—ইহাদের সংখ্যাও দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে—যতদিন শ্রেণী বৈষম্যকে ভিত্তি করিয়া উৎপাদন প্রথা ও রাষ্ট্র চালনা থাকিবে, ততদিন এই সঙ্ঘর্ষ চলিবেই। বুর্জ্জোয়াজী ও প্রোলেটারিয়েটের সঙ্ঘর্ষই শেষ সঙ্ঘর্ষ। ইহার পর প্রোলেটারিয়েট জয়লাভ করিলেই শ্রেণীবিহীন সমাজ স্থাপনা ও সাম্যবাদে পৌছান সম্ভব হইবে।”

# মার্কসের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা

জার্ম্মাণীর রাইনল্যাণ্ডের অন্তর্গত ট্রিভস্ নগরে ৫ই মে ১৮১৮ সালে মার্কসের জন্ম—১৮৩৫ সালে স্কুল পরিত্যাগ ও 'বন্' বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ—১৮৪১ সালে 'ডক্টরেট' ডিগ্রী প্রাপ্তি।

হেগেলপন্থীদের সহিত সংযোগ—পরে 'রিনিশে ত্সাইটুং' পত্রিকার সহিত সংশ্রব—১৮৪২ সালে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ। প্রুশিয়ার স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য দুইজন 'সেন্সর' নিয়োগ—পরিচালক সমিতির সহিত সম্পাদক মার্কসের মতভেদ ও অবসর গ্রহণ—ফলে পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু। জেনী ওয়েষ্টফ্যালেনকে বিবাহ।

বন্ধু আর্ণল্ড রুজের সহিত প্যারি গমন ও একটী পত্রিকা প্রকাশ। এঙ্গেলস্ সহ 'ধার্ম্মিক পরিবার' পুস্তক রচনা—ইহাতে হেগেলপন্থীদের আক্রমণ ও জার্ম্মাণ সর্ব্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক গুণ বর্ণনা। আবার প্রুশিয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ—ফলে প্রুশিয় গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে ফরাসী সরকার কর্ত্তৃক বিতাড়ন ও ব্রুসেলস গমন।

১৮৪৬ সালে ব্রুসেলসে কেন্দ্রীয় করেসপণ্ডেস সমিতি স্থাপন। ১৮৪৭ সালের গ্রীষ্মকালে লণ্ডনে কম্যুনিষ্ট সম্মেলন আহ্বান ও কম্যুনিষ্ট লীগের প্রতিষ্ঠা। ১৮৪৭ সালের শেষে লণ্ডনে লীগের দ্বিতীয় অধিবেশন—মার্কস্ ও এঙ্গেলসের উপর লীগের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করার ভার অর্পন ও ফলে ১৮৪৮ সালে বিখ্যাত 'কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো' প্রকাশ।

ইহার অল্পদিন পরেই প্যারিতে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব—জার্মাণী পর্য্যন্ত তাহার বিস্তৃতি। ভীত বেলজিয়ান্ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিতাড়ন। প্যারি বিপ্লবের পর তথাকার ক্ষণস্থায়ী গবর্ণমেণ্টের আহ্বানে প্যারি গমন—পরে কতিপয় কমরেড সহ কলোন গমন—'নিউ রিনিশে ত্সাইটুং' পত্রিকা প্রকাশ—১৮৪৯ সালে ১৯শে মে ইহার শেষ সংখ্যা প্রকাশ—পুনরায় প্যারি ও তথা হইতে ইংলণ্ড গমন—ব্রিটীশ মিউজিয়মে দশ বৎসর কাল একাগ্রভাবে অর্থনীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন; অত্যধিক অর্থকষ্ট—আমেরিকার 'নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে' প্রবন্ধ প্রকাশ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন—১৮৬২ সালে 'ট্রিবিউনে' শেষ লেখা।

১৮৬৩ সালের এপ্রিলে পোলাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপক সভার অধিবেশন। বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনের অনুকূল অবস্থা—১৮৬৪ সালে ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রথম আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ বা ফার্ষ্ট ইণ্টারন্যাশনাল স্থাপন—'ফাদার মার্কস্' আখ্যা লাভ—হেগ কনফারেন্সে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের অফিস নিউ ইয়র্কে স্থানান্তর করণ। ১৮৬৭ সালে 'ক্যাপিট্যালের' প্রথম ভাগ প্রনয়ণ।

পুনরায় অর্থকষ্ট—১৮৭৩ সালে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কর্ম্মময় জীবন হইতে অবসর গ্রহণ—'ক্যাপিটালের' দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ—স্ত্রী কন্যার মৃত্যু—১৮৮৩ সালে ১৪ই মার্চ্চ মৃত্যু—মৃত্যুর পর এঙ্গেলস্ কর্ত্তৃক 'ক্যাপিট্যালের' সমাপ্তি করণ।

# ভ্রম-সংশোধন

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০ | পৃষ্ঠায় | ২১ | লাইনে | 'ষে' | স্থানে | 'যে' | হইবে |
| ২৯ | ,, | ১৪ | ,, | ,(কমা) | | উঠিয়া | যাইবে |
| ৩০ | ,, | ৬ | ,, | 'এই' | স্থানে | 'একই' | হইবে |
| ৩২ | ,, | ২১ | ,, | 'প্রশ্ল' | ,, | 'প্রশ্ন' | ,, |
| ৩৯ | ,, | ৫ | ,, | 'ষন্ত্র' | ,, | 'যন্ত্র' | ,, |
| ৫০ | ,, | ১ | ,, | 'বঞ্চিত' | ,, | 'সঞ্চিত' | ,, |
| ৫৭ | ,, | ৪ | ,, | 'মূলধন' | ,, | 'মূলধনের' | ,, |
| ৫৯ | ,, | ১৬ | ,, | 'পুজিপতি' | ,, | 'পুঁজিপতি' | ,, |